বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ



মনি বাগচি

স্মরণীয়-বরণীয়-৫

বিশ্বকবি

রবীন্দ্রনাথ

অনি বাগচি

ঈশরা পুস্তকালয়
৮/১ সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

কবি-রবি

স্নিগ্ধ-রক্ত-রাগ রথে পূরব অম্বরে
বালারুণ-রূপে যবে রবীন্দ্র-উদয়,
উঠেছিল দিগ্‌-বধূ গাহি জয় জয় ;
হেরি তারে। চিনি তারে ওর কণ্ঠস্বরে,
মেলি আঁখি কহে বঙ্গ আনন্দের ভরে,
এ কি আলো! এ কি গান! গীতি-জ্যোতির্ময়
এ যে গো আমারি রবি, আর কারো নয় ;
দিলা বিধি সর্ব্বদৈন্য ভুলাবার তরে।
যত বেলা বাড়ে ঊর্দ্ধ হতে ঊর্দ্ধে
চলে তার আলো রথ, ঝরে শতধারে
অদ্ভুত বরষা, বিশ্ব চাহি নভঃ পানে
হেরে মধ্যাকাশে রবি, অপূর্ব্ব ভাস্কর।
বঙ্গের, কি ভারতের কে কহিবে তারে ?
রবি জগতের কবি আজ কে না জানে ?

—কামিনী রায়

আকাশের রবি একদিন নেমে এসেছিল বাংলার শ্যামল অঙ্গিনে।

ইতিহাসের এক দুর্লভ লগ্নে আমরা পেয়েছিলাম রবীন্দ্রনাথকে। তিনি যেন সহস্ররশ্মি সূর্য। রশ্মি তাঁর বাণীর দ্যুতি। বাংলার গৌরব [illegible] তিনি — তিনিই আমাদের চিরকালের কুবেরের নিধি। গানে, কবিতায়, গল্পে উপন্যাসে প্রকাশে তাঁর লোকোত্তর প্রতিভা।

রবীন্দ্রনাথ যেন বিশাল সমুদ্র — সে সমুদ্রের বুকে উঠেছে ঢেউয়ের পর তরঙ্গ, ভাবের তরঙ্গ, রূপের তরঙ্গ। সে তরঙ্গ-ঢেউ আমাদের মনের মাঝে জাগিয়ে তোলে সুন্দরের আবেদন। সত্যের আবেদন আর কল্যাণের আবেদন। রবীন্দ্রজীবন কথা সত্য, শিব ও সুন্দরের আলেখ্য।

মানবসভ্যতার ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ একটি আশ্চর্য প্রকাশ। একটি [illegible] বিদ্যার উদয় অভ্যুদয়।’ জ্যোতির্ময় তাঁর জীবন, চির-ভাস্বর তাঁর প্রতিভা। [illegible] এই শ্যামলা পৃথিবী, এই নদীপ্রান্তর অরণ্য, আমাদের বাংলা — সবকিছু রবির আলোয় উদ্ভাসিত। তিনি যেন নিখিলভুবনমানস উৎসারিত ঝরনা: অনির্বাণ আলো। রবির আলোয় ভরে উঠুক তোমাদের মন, তোমাদের শিক্ষা, তোমাদের চেতনা। তোমরা যখন বড় হবে, তখন দেশের জীবনের ও মননের প্রতিটি মুহূর্তের সাথে মিশে যাবেন রবীন্দ্রনাথ।

[illegible]

॥ এক ॥

-বৌঠান, বৌঠান, শোনো তো।

- কি শুনব, রবি?

- এই যে একটা কবিতা লিখেছি—

- কবিতা লিখেছ! পড়ো তো, শুনি।

- সবটা পড়বনা, শুধু দুটি লাইন পড়ে শোনাব।

- আচ্ছা দুটি লাইনই পড়ে শোনাও।

অনিন্দ্যসুন্দর কণ্ঠে বালক পড়ে:

নিশি দিশি দাঁড়িয়ে আছ মাথায় লয়ে জট,
ছোট ছেলেটি মনে কি পড়ে, ওগো প্রাচীন বট।

- সত্যি বলো বৌঠান, কেমন হয়েছে?

- খুব চমৎকার। বড়ো হয়ে তুমি একজন বড়ো কবি হবে। আমি হয়ত তখন বেঁচে থাকবেনা, কিন্তু আমার কথা তুমি ভুলোনা, রবি।

এই বালক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আর বালক যাকে বৌঠান বলে সেদিন সম্বোধন করেছিল তাঁর নাম কাদম্বরী দেবী। ইনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের এক অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী। তিনিই ছিলেন তখন বাড়ির ছোট বৌ, রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বয়সে কিছু বড়ো। ছোট দেওরটিকে তিনি যেমন স্নেহ করতেন, তেমনি আদর করতেন। ইনি নিঃসন্তান ছিলেন, তাই তাঁর অন্তরের সমস্ত স্নেহ গিয়ে পড়েছিল এই দেওরটির ওপরে। দেওর সম্পর্কে বৌঠানের তিনটি ঐতিহ্যশালী অন্তরে অন্তরে মিলে গিয়েছিল।

space

৬ নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি।

সেইখানেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ি।

বাড়ি নয়, যেন রূপকথার এক বিরাট পুরী। মহলের পর মহল। একটা বিরাট চত্বরের ওপর তৈরি হয়েছিল সেই বাড়ি। বাড়ির মধ্যেই ছিল একটা ঘাট-বাঁধানো পুকুর। তার পূব ধারের প্রাচীরের গায়ে প্রকাণ্ড একটা চীনা বট, দক্ষিণ ধারে নারকেল গাছের সারি। বটগাছটার গুঁড়ির চারদিকে অনেকগুলো ঝুরি নেমে তার তলাটা অন্ধকারময় করে তুলেছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বালক বয়সে, দুপুরবেলায় বাড়ির ছাদ থেকে, এই পুকুরঘাট দেখতেন আর দেখতেন বটগাছের তলা। মনে তাঁর ভরে উঠত কৌতূহল আর রহস্য।

আর কি দেখতেন?

'আরো দূরে দেখা যাইত, তরুচূড়ার সঙ্গে মিশিয়া কলিকাতা শহরের নানা আকারের ও নানা আয়তনের উচ্চনীচ ছাদের শ্রেণী মধ্যাহ্নরৌদ্রে প্রখর শুভ্রতা বিচ্ছুরিত করিয়া পূর্বদিগন্তের পাণ্ডুবর্ণের নীলিমার মধ্যে উধাও হইয়া চলিয়া গিয়াছে। সেই-সকল অতিদূর বাড়ির ছাদে এক-একটা চিলে কোঠা উঁচু হইয়া থাকিত; মনে হইত তাহারা যেন নিশ্চল তর্জনী তুলিয়া চোখ টিপিয়া আপনার ভিতরকার রহস্য আমার কাছে সংকেতে বলিবার চেষ্টা করিতেছে।... আবার উপরে আকাশব্যাপী খরদীপ্তি, তাহারই দূরতম প্রান্ত হইতে চিলের সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ ডাক আমার কানে আসিয়া পৌঁছিত এবং সিঙ্গিবাগানের পাশের গলিতে দিবাসুপ্ত নিস্তব্ধ বাড়িগুলার সম্মুখ দিয়া পসারি সুর করিয়া 'চাই চুড়ি চাই, খেলোনা চাই' হাঁকিয়া যাইত — তাহাতে আমার সমস্ত মনটা উদাস করিয়া দিত।'

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ি শুধু একটি ধনী ও অভিজাত পরিবারের বাসস্থান নয়। বাংলাদেশের প্রভাতের আশা এবং আকাঙ্ক্ষার আলিম্পন· এখানে থমকে গিয়েছে বিবর্তন। এই বাড়ি যেন দুই যুগের সাক্ষী একটা বিরাট দুর্গপ্রাসাদ। যেমনি সুন্দর তার রূপ তেমনি তার প্রাচীরে প্রাচীরে আর ঘরে ঘরে যে ইতিহাস এর কোণায় কোণায়, খিলানে খিলানে। উনিশ শতকের নবজাগরণের দীপ্তিচ্ছটা প্রথম বিকীর্ণ হয়েছিল সারা দেশে এখান থেকেই। অনেক ঘর, অনেক মহল আর অসংখ্যখানি কামরা — এইসব মিলিয়ে ছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ি। এই বাড়িতে বিকশিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ — এই বাড়ির এই তিন পুরুষ পরপর। দ্বারকানাথকে দিয়েই এ-বাড়ির ঐশ্বর্যের সূচনা। তিনি ছিলেন সেযুগের কলকাতার অন্যতম বড় ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ী বললে ঠিক বলা হয় না। তিনি ছিলেন সর্বপ্রধান দাতা, সকলের অকৃত্রিম পরামর্শদাতা আর দেশবাসীর প্রায় একচ্ছত্র অধিপতি। রাজা রামমোহন রায়ের অনুগামী যে ভক্তবৃন্দের মধ্যে দ্বারকানাথই ছিলেন প্রধানতম। এক সময়ে বহুদিন নিমক মহলের দেওয়ানি করবার পর তিনি স্বাধীন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। ব্যবসায়ের সঙ্গে ছিল জমিদারী — এই ছিল তাঁর ঐশ্বর্যের সোপান। ঐশ্বর্যের সঙ্গে ছিল সহৃদয়তা, অমিতব্যয় আর বিলাসিতা। বেলগাছিয়ার সুরম্য বাগানবাড়িটি ছিল দ্বারকানাথের বিলাস-নিকেতন।

এই বিলাস-নিকেতনের সৌন্দর্য ও জাঁকজমক দেখে ইংরেজরা পর্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন। মহারানি ভিক্টোরিয়ার আমলে তিনি যখন লণ্ডনে বেড়াতে গিয়েছিলেন তখন

সেখানে তিনি মাসে এক লাখ টাকা করে খরচ করতেন — তখনকার দিনের লাখ টাকা! সেখানকার লোকেরা তাই তাঁর নাম দিয়েছিল 'প্রিন্স'। ঐশ্বর্য, বিলাসিতা আর বিষয়বুদ্ধি — এর মধ্যেই কিন্তু প্রিন্স দ্বারকানাথের পরিচয় সম্পূর্ণ নয়। আগেই বলেছি, তিনি ছিলেন রামমোহনের বন্ধু; বন্ধুর আদর্শের প্রভাব অনেকটা গিয়ে পড়েছিল তাঁর ওপর। প্রকৃত সংস্কৃতির মানুষ ছিলেন তিনি। দেশের সকল শুভকর্মের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল গভীর।

এই দ্বারকানাথের বড়ো ছেলে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাংলার নবজাগৃতির সূচনাপর্বেই তাঁর জন্ম। উনিশ শতকের বাংলার ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, শিক্ষা ও রাজনীতি — এমন দিক নেই যা তাঁর প্রতিভার স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে না উঠেছিল। দ্বারকানাথের পুত্র তিনি, কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন রামমোহনের মানসপুত্র, তাঁরই চিন্তাধারার উত্তরসাধক। তাঁরই জীবনজ্যোতিতে একটি শতাব্দীর জীবনধারা উদ্ভাসিত। উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে রামমোহনের পর দেবেন্দ্রনাথই বিরাট পুরুষ। বিরাট এবং মহৎ। উপনিষদের ভাবমূর্তি দেবেন্দ্রনাথ; তাঁর সমাজজীবনের ইতিহাস দুঃখের মধ্যে আলোর অন্বেষণ। ঐশ্বর্যসম্ভারের গভীরে কখনো বাঁধা পড়েনি তাঁর চিত্ত।

বিষয়ের দায়িত্বকে স্বীকার করেছিলেন তিনি, কিন্তু সেই বন্ধনকে অতিক্রম করে তিনি হয়ে উঠেছিলেন মহর্ষি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চেতনা ছিল ঈশ্বরমুখী। মন তাঁর ঘুরে ফিরেছে হিমালয়ের দুর্গমতায় আর বোলপুর-

পুকুরের নির্জন প্রান্তরে। অথচ তিনি নির্জনবাসবিলাসী মানুষ ছিলেন না। তাঁর মুক্ত শুভ্র মানস তাঁর চেতনাকে নিযুক্ত করেছিল সত্যাভিমুখী। তাঁর জীবন ছিল নিবিড় সত্যানুভূতির জীবন। ধর্ম ও ঐশ্বর্যের মধ্যে থেকে তিনি প্রতিদিন করতেন কর্তব্যের কর্ম, অন্যদিকে ঈশ্বরচর্চার।

দেবেন্দ্রনাথ যুগ-স্রষ্টা। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের তিনি যেমন নেতৃস্থানীয় ছিলেন, তেমনি সমকালীন বাংলার সমাজ-জীবনের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে তিনিই ছিলেন প্রধান। যখন উপনিষদের একটি ছিন্নপত্রের একটি শ্লোক তেজোদীপ্ত বিলাসী ও ইংরেজি শিক্ষিত তরুণ দেবেন্দ্রনাথের মনের মধ্যে যে-বিপ্লব এনে দিয়েছিল, তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল অসামান্য। এই উপনিষদই হয়ে উঠেছিল তাঁর জীবনের ভিত্তি, প্রাণের নিঃশ্বাস। তাঁর চিন্তা-ভাবনা ও ব্রাহ্মধর্ম মানবীয় সবই এই উপনিষদের ভাবধারায় ছিল সিঞ্চিত।

তত্ত্ববোধিনী সভা আর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা— মহর্ষির জীবনের এই দুটি মহৎ কীর্তি। তত্ত্ববোধিনীর যুগ বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে একটি স্বর্ণযুগ। এই যুগের অগ্রগামী নেতা ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। বাংলা ভাষার উন্নয়ন, সমাজসংস্কার, ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির চর্চা, নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজাদের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রয়াস, খ্রীষ্টান পাদ্রিদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম — এমনই সব কাজ করা হয়েছিল তত্ত্ববোধিনী সভার মারফৎ থেকে। সংস্কৃতির সঙ্গে রাজনীতির মিলনও তিনি ঘটিয়েছিলেন।

ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন ছিল তাঁর সেই বিস্তার পরিণত রূপ। তিনিই ছিলেন এর প্রথম সম্পাদক। নবীন, প্রবীণ, মধ্যপন্থী ও প্রগতিশীলদের মিলনক্ষেত্র ছিল এই সমিতি। সেদিন এই সমিতির পক্ষ থেকে ভারতের জন্য স্বায়ত্তশাসন দাবী করে যে আবেদনপত্র বিলাতের পার্লামেন্টে পাঠানো হয়েছিল তাতে দেবেন্দ্রনাথের স্বাক্ষর ছিল। এইটে ছিল সেদিনকার পরাধীন ভারতবাসীর প্রথম রাজনৈতিক দাবী। এ-ঘটনা আমাদের জাতীয় মহাসভা বা কংগ্রেসের জন্মের তেত্রিশ বছর আগের কথা। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন অবিচলিত — অপ্রমত্ত চিত্তেই তিনি তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের ভার বহন করেছেন। উপনিষদের সেই বাণী — ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ — [illegible] জীবনে যেন অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়ে উঠেছিল।

দেবেন্দ্রনাথের আমলেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি সারা বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল। এইখানে বসেই তিনি সমগ্র দেশের স্পন্দন অনুভব করতেন, আর এইখানেই তিনি আকর্ষণ করেছিলেন সকলকে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে এসে মিলেছিল তিনটি স্রোত — হিন্দু, মুসলমানী আর ইংরেজি। এ বাড়িতে খুব ঘটা করে দুর্গোৎসব হতো। কুমোরেরা বাড়িতেই প্রতিমা তৈরি করতো। পূজোর তিন দিন বাড়ির উঠোনে যাত্রা হতো। দেবেন্দ্রনাথ কে পরামর্শ দেবার চেষ্টা করে সরস্বতী পূজোই করতেন। ক্রমশঃ এই বাড়ির আর একটু বর্ণনা দিই।

দেউড়িতে দারোয়ান আর জুড়িগাড়ির ভিড়, বাবুদের বসবার ঘরের দরজায় এক-একজন করে হরকরা ; বৈঠকখানায় ফরাস বিছানো ; আলবোলা অম্বুরি তামাক, তাকিয়া দেওয়া, গদিওয়ালা একটা উঁচু আসনে কর্তা বসতেন ; যাঁদের বরাতে অভ্যাগত আর মোসাহেবেরা বসতেন — তিন দিন নবাবী আমলের চাল ও কায়দা। তারপর মুঘল যুগের সভ্যতার সঙ্গে ইংরেজি সভ্যতার একটা যুঝাযুঝি চললো — জয়ী হলো ইংরেজি সভ্যতা। বৈঠকখানার সে-জলুসও বিদায় উঠে গেল, তার জায়গায় এলো ড্রয়িং রুম আর দামী বিলিতি আসবাবপত্র। আগে এ বাড়ির কর্তা ও ছেলেদের পোশাক ছিল জোব্বা, চাপকান, কাবা, পাগড়ি ; তারপর তার বদল হয়ে দেখা দিল হ্যাট কোট, ওয়েস্টকোট আর প্যান্টলুন।

ঠাকুরবাড়ির ভাষায় ছিল আগে ফারসি ও আরবি শব্দের আধিক্য, তার পরে এলো ইংরেজি। বড়মানষী আহার ছিল তখন কালিয়া পোলাও, কোর্মা কোপ্তা, কাবাব প্রভৃতি মোগলাই রকমের ; তার পর সেখানে ধীরে ধীরে দেখা দিল ইংরেজি মতে চপ, কাটলেট, পুডিং, ব্র্যান্ডি ও শেরি ইত্যাদি। এই-ভাবে হিন্দু, মুসলমানী ও ইংরেজি — এই তিন সভ্যতার উপাদান একত্র হয়েছে এই বাড়িতে। এই তিন সভ্যতার ত্রিবেণী সঙ্গম হয়েছে জোড়াসাঁকোর এই ঠাকুর বাড়িতে। কালে কালে সেই জোড়াসাঁকোর বাড়ির রূপ বদলেই চললো। বৈঠকখানা হলো ড্রয়িং রুম। দফতরখানা হলো স্টাডি রুম। এই বাড়ির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, উনিশ শতকের বাংলারই সাংস্কৃতিক ইতিহাস।

সুপ্রথার অলৌকিকতায় সমৃদ্ধ এই বাড়ি। শালের পাগড়ি, জামা

বঙ্কিমচন্দ্র এসেছেন এ-বাড়িতে, তারো আগে এসেছেন রামমোহন, এসেছেন চটি-চাদরে বিদ্যাসাগর; এই বাড়িতেই হত মজলিস গালিচার ওপর বসে ভরাট গলায় টেনে সুরে মাইকেল আবৃত্তি করেছেন মেঘনাদবধ কাব্য; বিহারীলাল শোনাচ্ছেন সারদামঙ্গল, তানপুরা হাতে নিয়ে গানপাগল শ্রীকণ্ঠ সিংহ ঘরে-ঘরে গান গেয়ে ফিরেছেন; এই বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াতো কত রাজা-মহারাজা ও ইংরেজ-রাজপুরুষদের গাড়ি। এই বাড়িতেই এলেন জাপানী শিল্পশাস্ত্রী ওকাকুরা, ভগিনী নিবেদিতা।

এমনি যুগে যুগে কত না আলোকবর্তিকার পদচিহ্ন পড়েছে এই বাড়িতে — রামমোহন থেকে গান্ধী-সুভাষচন্দ্র! উনিশ শতকের ঊষাকাল থেকে বিংশের প্রখর মধ্যাহ্ন! ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শুরু থেকে ব্রিটিশ রাজত্বের শেষ! সদ্য জাগ্রত আভিজাত্যের আদি থেকে ক্রমপ্রসারিত বাঙালি সম্প্রদায়ের সূত্রপাত! ভারতীয় সংস্কৃতির ধ্বনি ও বিশ্ব-সংস্কৃতির প্রতিধ্বনি এখানে এসেই শোনা যায়। জোড়াসাঁকোর এই বাড়িতেই ১৮৬১ সালের পঁচিশে বৈশাখ জন্মেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ তখন শেষ হয়েছে। মহাকালের রথের চাকা আরো দশ বছরের পথ উত্তীর্ণ হয়েছে। উনিশ শতকের নবজাগরণ যখন তার সকল সম্ভার নিয়ে ঠাকুরদের দিগন্ত উদ্ভাসিত করে তুলেছে, সেই সুলগ্নেই জন্ম হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের। দেবেন্দ্রনাথের সন্তানদের মধ্যে তিনিই ছিলেন কনিষ্ঠ পুত্র।

—

॥ দুই ॥

'জল পড়ে, পাতা নড়ে।'

'জল পড়ে, পাতা নড়ে।'

জোড়াসাঁকোর বিশাল ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুরের একটি নিভৃত ঘরের মধ্যে বসে শিশু রবি পড়ছেন বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ। রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন : 'আমাদের ছিল মস্ত একটা সাবেক কালের বাড়ি, তার ছিল তোলা অনেক ভাঙা ঢাল বর্শা ও মর্চে পড়া তলোয়ার খাটানো দেউড়ি, ঠাকুরদালান। তিন-চারটে উঠোন, সদর অন্দরের বাগান, সম্বৎসরের গঙ্গাজল ধরে রাখবার মোটা মোটা জালা-সাজানো অন্ধকার ঘর।... কলকাতা শহরের বুক তখন পাথরে বাঁধানো হয়নি। অনেকখানি কাঁচা ছিল। তেলকলের ধোঁয়া আকাশের মুখে তখনো কালি মাড়েনি। ইমারত অরণ্যের ফাঁকায় ফাঁকায় পুকুরের জলের উপর সূর্যের আলো ঝিকিয়ে যেত। বিকেলবেলায় অশথের ছায়া দীর্ঘতর হয়ে পড়ত। হাওয়ায় দুলত নারকেল গাছের পাতার ঝালর। বাঁধা নালা বেয়ে গঙ্গার জল ঝর্নার মতো ঝরে পড়ত আমাদের দক্ষিণ-বাগানের পুকুরে। মাঝে মাঝে গলি থেকে পালকি-বেহারার হুঁই-হুঁই শব্দ আসত কানে, আর বড়ো রাস্তা থেকে সহিসের হেইয়ো হাঁক। সন্ধ্যাবেলায় জ্বলত তেলের প্রদীপ, তারই ক্ষীণ আলোয় মাদুর পেতে বুড়ি দাসীর কাছে শুনতুম রূপকথা। এই নিস্তব্ধপ্রায় জগতের মধ্যে আমি ছিলুম এক কোণের মানুষ। লাজুক নীরব নিশ্চঞ্চল।'

সেই কোণের মানুষ, সেই লাজুক বালক কেমন করে.

বিশ্ব-বরেণ্য কবি হয়ে উঠলেন, কেমন করে রবির কিরণে ছড়িয়ে পড়লো বিশ্বভুবনে, সেও এক রূপকথার কাহিনী। আজ থেকে শতবর্ষ পরে বাংলার এক নিভৃত পল্লীভবনে সন্ধ্যার নিস্তব্ধ প্রহরে মায়ের কাছে বসে কোন কৌতূহলী বালক যখন জিজ্ঞাসা করবে, মা, রবিঠাকুরের গল্প বলো,— তখন সেই রূপকথার কাহিনী মা তাঁর ছেলেকে শোনাবেন। এমনি করেই বাংলার মায়েরা যুগ-যুগ ধরে তাঁদের ছেলেদের কাছে বলবেন নিখিল ভুবন আলো-করা এই রবীন্দ্রনাথের জীবনের অত্যাশ্চর্য কাহিনী।

কাহিনী নয় – ইতিহাস। যে-ইতিহাস তোমার, আমার, সকলের। 'বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।' তেমনি বাঙালীর চিত্ত-শতদলের রূপ মধু করেই বুঝি বিধাতা সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর সর্বকালের সেরা সৃষ্টি রবীন্দ্রনাথকে। বিধাতার এক অনন্যসুন্দর দুর্লভ সৃষ্টি রবীন্দ্রনাথ। জ্ঞানধন্য পিতার তিনি অলোকধন্য পুত্র। ইতিহাসের বরপুত্র তিনি। নিরবধি কালের অঙ্কে চলমান কালের সর্বোত্তম উপহার তিনিই। আকাশের রবি বাংলার শ্যামল অঙ্গিনায় নেমে এলো একদিন – তার আলোয় বিশ্ব-ভুবন হলো আলোকিত। প্রকৃতি হলো মুখর। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির রবি হলেন বিশ্ববন্দিত রবীন্দ্রনাথ। মানবমনের উত্তুঙ্গ শিখরদেশে সমুদ্ভাসিত সূর্য রবীন্দ্রনাথ। ভারতের তিনি গর্ব, বাঙালীর তিনি গৌরব – বিশ্বের বিস্ময় তিনি। সার্থক কবি-মনের মুকুটমণি রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের তুলনা তিনি নিজেই। তাঁর মূর্তি সুন্দর, তাঁর কাব্য সুন্দর, তাঁর হাস্য সুন্দর, তাঁর মন সুন্দর – তিনি সর্বাঙ্গসুন্দর। সৌন্দর্যের

সেই কথা রবীন্দ্রনাথ — সৌন্দর্যবোধের শেষ সীমান্ত নেই। সেই যেদিন যখন তিনি নিতান্ত বালক ছিলেন, তখন কোন্ ঊষালগ্ন দিয়ে প্রভাত সূর্যের আলো এসে তাঁর সমস্ত চেতনাকে দীপ্তিমান করে তুলেছিল — সেই তো রবীন্দ্রনাথের জীবনের আসল ইতিহাস। শতাব্দীর পরে তিনি যেন একটি প্রদীপ্ত আলোকশিখা। শতবর্ষের সেই আলো যুগ থেকে যুগান্তরে, কাল থেকে কালান্তরে পরিব্যাপ্ত হয়ে তোমার আমার সকলের অন্তরকে যেন জ্যোতির্ময় করে তুলেছে। এ আলো অনির্বাণ। এ-জ্যোতি চিরঅম্লান। এসো, আজ আমরা সকলেই মিলে এই নির্মল আলোকতীর্থে স্নান করি আর বলি:

তোমারি মধুর রূপে ভরেছ ভুবন
মুগ্ধ নয়ন মম পুলকিত মোহিত মন।"

space

রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার দিনগুলো ছিল নির্জন ও নিঃসঙ্গ। দিনের বেলায় দোতলার ঘরের কোণ থেকে দেখতেন ঘর-বাগানের পুকুরের কালো পাতিহাঁসের সাঁতার আর উঠোনে কাঁপানো মেঘ ও রোদের লুকোচুরি খেলা। সন্ধ্যাবেলায় চাকরদের কাছে শুনতেন নানা রকমের গল্প; রাতে মা-দিদিমার মুখে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী আর ছেলেভুলানো ছড়া। বাইরে মেশবার স্বাধীনতা ছিল না। লেখাপড়ায় হাতেখড়ি হলো 'বর্ণপরিচয়' দিয়ে। পড়াশুনা চললো কিছুদিন মাস্টারমশায়ের কাছে। ছেলেবেলার রবীন্দ্রনাথ ঠিক যেন ডাকঘরের অমল। কবির শেষবয়সে লেখা 'ছেলেবেলা' বইতে তোমরা পড়বে তাঁর বাল্যজীবনের কথা।

বর্ণপরিচয় শেষ হলো। একদিন বাড়ির বড় ছেলেদের স্কুলে যেতে দেখে বালক রবি কান্না জুড়লেন, আমিও স্কুলে যাবো। ভর্তি হলেন ওরিয়েন্টাল সেমিনারি নামে এক বিদ্যালয়ে। স্কুলের বাঁধাধরা পড়াশুনার বাইরে বালককে আরো অনেক কিছু পড়তে হতো বাড়ির মাস্টারের কাছে। এইভাবে গেল কিছুদিন। এরপর অভিভাবকেরা তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন নর্মাল স্কুলে। সেখানে পড়াশুনা হতো বিলাতী স্কুলের কায়দায়। স্কুলের পড়াশুনা ছাড়াও, বাড়িতেই ছেলেদের আরো অনেক বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়, যেমন হীরাসিংহ শেখে কুস্তি লড়া, জিমনাস্টিক করা, ছবি আঁকা শেখা, ইংরেজী পড়া। রবিবার সকালে বিজ্ঞান চিনানো পড়া। সব শিক্ষাই হতো বাংলা ভাষার ভিতর দিয়ে।

এইভাবে বালকের জীবনের প্রথম আট-নয় বছর কেটে যায়। নর্মাল স্কুল ছাড়িয়ে ছেলেদের ভর্তি করে দেওয়া হলো বেঙ্গল একাডেমিতে। এটা ছিল সাহেবদের স্কুল। ইংরেজিভাষায় লেখাপড়া, বিলেতি বলা-কওয়া চালচলন রপ্ত করবে এইজন্য সেখানে দেওয়া। স্কুলের বাঁধাধরা পাঠ্যতালিকার বাইরে নানা রকম সাহিত্য বই পড়তে বালকের খুব আনন্দ হতো। বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের আলমারি থেকে নিয়ে সেই স্কুলের বই তিনি পড়ে ফেলেননি — সেসব বইয়ের যতটুকু বুঝতেন তার অনেকটাই বুঝতেন না — সে বালকই জানতেন।

তাঁর শৈশব কেটেছে খুবই সাদাসিধা ভাবে। বাবুগিরি বা বিলাসিতার নাম-গন্ধও ছিলনা। রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন: 'আহারে আমাদের শৌখিনতার গন্ধও ছিলনা। কাপড়-চোপড় এতই যৎসামান্য ছিল যে এখনকার ছেলের চক্ষে

তাহার তালিকা ধরিলে সম্মান হানির আশঙ্কা আছে। বয়স দশের কোঠা পার হবার পূর্বে কোনোদিন কোনো রকমেই মোজা পরি নাই। শীতের দিনে একটা সাদা জামার উপরে একটা সাদা জামা-ই যথেষ্ট ছিল।' অনেক গুণী লোকের যাওয়া-আসা ছিল এই বাড়িতে। অক্ষয় দত্ত আসতেন, রাজনারায়ণ বসু — আসতেন কত কবি, সাহিত্যিক, গায়ক আর দার্শনিক। এঁরা সবাই আসতেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আকর্ষণে। এইসব গুণী ও জ্ঞানীজনের সাহচর্য লাভ করে সেই বয়সেই অনেক কিছু জ্ঞান অর্জন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন এগারো বছর নয় মাস। অনেকদিন প্রবাসে কাটিয়ে মহর্ষি বাড়ি ফিরেছেন। বাড়ির কর্তা তিনি; এই তিনি যখন কলকাতায় থাকতেন, তখন সমস্ত বাড়িটা যেন তাঁর উপস্থিতিতে গম্‌গম্‌ করতে থাকত। এবার তিনি বললেন ছেলেদের পৈতা দেবার কথা। সেইমতো ঠিক হলো উপনয়ন — বড় মেয়ের বড় ছেলে সত্যপ্রসাদ আর নিজের ছোট দুই ছেলে সোমেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ। বালক রবি নতুন ব্রাহ্মণ হলেন; মুণ্ডিত মস্তক। খুব উৎসাহের সঙ্গে তিনি গায়ত্রীমন্ত্র জপ করেন। ভূর্ভুবঃ স্বঃ — এই মন্ত্রের তাৎপর্য বুঝবার মতো বয়স তখন বালকের নয়, তবু একদিন, রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'আমাদের পড়িবার ঘরে শানবাঁধানো মেঝের এক কোণে বসিয়া গায়ত্রী জপ করিতে করিতে সহসা আমার দুই চোখ ভরিয়া কেবলই জল পড়িতে লাগিল।'

পৈতে-পর্ব তো চুকে গেল, কিন্তু বালকের ভাবনা হলো এই ন্যাড়া মাথায় তিনি স্কুলে যাবেন কি করে। এমন সময় একদিন হঠাৎ তেতলার ঘরে তাঁর ডাক পড়লো। সেইঘরে থাকতেন মহর্ষিদেব। এতো বয়স পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন তাঁর

সময় এত কাছাকাছি আসার সুযোগ পাননি।

—হিমালয়ে যেতে চাও?

— চাই।

কিশোর কবি চললেন তাঁর পিতার সঙ্গে হিমালয়ে। যাবার পথে তাঁরা কয়েকদিন বোলপুরে থেকে গেলেন। এইখানেই মহর্ষি পেয়েছিলেন তাঁর মনের আসন, রচনা করেছিলেন শান্তিনিকেতন। চারদিকে ধু ধু করছে দিগন্ত প্রসারী মাঠ— দূরে তালগাছ ঘেরা ভুবনডাঙা গ্রাম। চারদিকের পরিবেশ যেমন শান্ত, তেমনি নির্জন। বালকের দুই চোখ যেন দশ চোখ হয়ে চারদিকের অবারিত সৌন্দর্য দেখতে থাকে। আনন্দের সীমা রইল না। এখানে চাকরদের শাসন নেই। সবদিকে ধু ধু করছে মাঠ — মাঠের মাঝে মাঝে খোয়াই। ইচ্ছেমত ঘুরে বেড়াবার যে কী আনন্দ। সেই সঙ্গে পিতার নিবিড় সান্নিধ্য লাভ করলেন বালক। এইখানেই সেই বয়সে বালকের মনে এই উপলব্ধি হয়েছিল যে, সংসারের সকল কাজ করেও তাঁর পিতার জীবনের লক্ষ্য ছিল ঈশ্বরের আরাধনা।

বালকপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে মহর্ষি এবার চললেন হিমালয়ে। ডালহৌসী পাহাড়ে বক্রোটা শৈলশিখরে কিছুদিন ছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাবার সঙ্গে। দূরে ঝাপসা পাহাড়, চারদিকে পাইন বন, নদীর বাঁধ, সব দেখা — এর মধ্যে বালক ঘুরে বেড়াতেন একা একা। প্রথম প্রবাসজীবনের স্মৃতি 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে কবি এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন: 'বক্রোটায় আমাদের বাসা একটি পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় ছিল। তখন শীত অত্যন্ত প্রবল। এখানেও আপন ইচ্ছায় পাহাড়ে ভ্রমণ করিতে পিতা একদিনও আমাকে বাধা দেন নাই। নিম্নবর্তী এক অধিত্যকায় বিস্তীর্ণ কেলুবনে আমি প্রায় বেড়াইতে যাইতাম।

বনস্পতিগুলো প্রকাণ্ড দৈত্যের মতো ছায়া লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। বনতলের অন্ধকারে পত্ররাশির উপরে ছায়া-আলোকের রেখাবলী।... রাত্রে ছিটকিয়া উঠিয়া কাচের জানালার ভিতর দিয়া নক্ষত্রলোকের অস্পষ্টতায় পর্বতচূড়ার পাণ্ডুবর্ণ তুষারদীপ্তি দেখিতে পাইতাম।' ব্রাহ্মমুহূর্তে ঘুম থেকে উঠে মহর্ষির বারান্দায় পিতাকে উপাসনারত দেখে বালকের মনে বিস্ময়ের সীমা থাকেনা।

যে চারমাস কাল বাবার সঙ্গে তিনি হিমালয়ে ছিলেন সেই সময়টা কিন্তু বৃথা যায়নি। দেবেন্দ্রনাথ ছেলেকে নিয়মিত পাঠ দিতেন — সংস্কৃত, ইংরেজি ও জ্যোতিষ। ইংরেজি বই থেকে জ্যোতির্বিদ্যা সরল ভাবে বুঝিয়ে দেন, খোলা আকাশের তলে বসে নক্ষত্র চেনান। পিতার কাছে যা পাঠ গ্রহণ করেন, সেই বাংলায় লিখে ফেললেন। হিমালয়ে চার মাস কাটিয়ে কলকাতা বাড়ি ফিরলেন। এবার ভৃত্য-মহল পার হয়ে অন্দর মহলে মায়ের ঘরে একটা বড় আসন দখল করে বসলেন রবীন্দ্রনাথ। আবার তাঁকে স্কুলে যেতে হয়। স্কুলের চার-দেয়াল-ঘেরা ঘরকে কয়েদখানা বলে মনে হয়। মনে জাগে নানা আশা, আকাঙ্ক্ষা, বিচিত্র সাধ। এগারো বছর বয়সে লেখা একটি কবিতায় প্রকাশ পায় সেইসব মনের কথা।

স্কুল ভালো লাগেনা। তাই স্কুলে যাওয়ার থেকে না-যাওয়ার দিন বেড়ে চলে। শেষে ঠিক হলো স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনে বাড়িতে পড়ানোর। ব্যবস্থা হলো। রইলেন [illegible] গৃহশিক্ষক। কিন্তু ঘরে পড়াশুনো বিশেষ এগোলো না। তখন বাড়ির আর সব ছেলেদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে ভর্তি করে দেওয়া হলো সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে। এটাই ছিল তখন শহরের নাম-করা বিদ্যালয়। সেখানে জোড়াসাঁকোর গাড়ি চেপে স্কুলে যেতে থাকেন, কিন্তু বেশি দিন এখানে কাটলনা। এই সময়ে তাঁর মা, সারদাদেবী মারা গেলেন।

সারদা দেবী ছিলেন এই বিরাট সংসারের কর্ত্রী। তাঁর মৃত্যুতে সমস্ত সংসারটা যেন লক্ষ্মীহীন হয়ে গেল। চৌদ্দ বছর বয়সে মা-কে হারিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে পৃথিবীটা যেন শূন্য মনে হয়। পড়াশুনায় আর মন বসেনা। স্কুলে যাওয়া অনিয়মিত হয়ে উঠতে থাকে। বাড়ির মা-হারা ছোট ছেলে বলে দিদি ও বউদিদির আদরে ও আস্কারায় স্কুল-কামাই বেড়ে চললো। স্কুলে না গিয়ে বাড়িতে বসেই সুখে পড়েন বাংলা বই, বাংলা পত্রিকা। সেইসঙ্গে চলতে থাকে কবিতা রচনা। লেখার অধিকের প্রেরণা ছিলেন প্রধানই। তাঁর বৌঠান - কাদম্বরী দেবী। কুর সেন্ট স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা দিলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রমোশন পেলেন না। এন্ট্রান্স ক্লাস পর্যন্ত তিনি সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে পড়েছিলেন। ক্লাসে না উঠায় স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়।

স্কুল ছাড়বার পরে বাড়িতে পড়াশুনার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু ধরাবাঁধা শিক্ষার মধ্যে তাঁকে বাঁধা গেলনা। বাড়িতেও নানারকমের আলোচনা চলতো। তারই মধ্যে বাড়িয়ে পড়েন রবীন্দ্রনাথ আর কলমের মধ্যে দিয়ে লিখে যান কবিতা, গান। তাঁর বয়স যখন ষোল তখন তাঁদের বাড়ি থেকে বেরুলো 'ভারতী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক হলেন তাঁর বড়দা দ্বিজেন্দ্রনাথ। বাড়ির লোকেরা সবাই লেখক। নতুন কাগজের প্রথম সংখ্যা থেকে বালকের লেখনী থেকে বের হতে থাকে নতুন রচনা— গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির আবহাওয়াটাই ছিল অন্য [redacted] রকমের। গানে ও গীতে ভরপুর ছিল এই বাড়ি, সাহিত্যের চর্চা তেমনি সেখানে ছিল। তেমনি ছিল নাটকের মহড়া। তাঁর কবি-প্রতিভার উন্মেষে এমনি আলো-বাতাস পরিবেশের প্রয়োজন ছিল।

—

॥ তিন ॥

(সম্রাট শাজাহান যখন গুজরাটের সুবেদার ছিলেন তখন তিনি এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের ওপর গড়ি তৈরি করিয়েছিলেন।)

আমেদাবাদের শাহীবাগ।

জজ সাহেবের বিরাট বাড়ি; বাড়ি নয়, মোগল যুগের বিরাট প্রাসাদ; তারই প্রাসাদ। বাড়ির নীচেই সবরমতী নদী। জজ সাহেব হলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা। সিভিলিয়ান। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। প্রথমদিন সখেদে সখেদে তিনি তাঁর বাবার কাছে ছোট ভাইটির প্রসঙ্গটা তুললেন।

— রবির তো সতেরো বছর বয়স হল, বাবা।

— আমার উদ্বেগ তো রবিকে নিয়েই। কি করা যায় ওকে নিয়ে?

— আমি বলি কি ওকে বিলেতে পাঠিয়ে ব্যারিস্টার করে আনা যাক।

— ব্যারিস্টারি পড়তে হলে ইংরেজিটা ভালো করে জানা দরকার।

— আমি সেজন্য রবিকে আমার কাছে কিছুদিন রেখে ইংরেজি ভালো করে শিখিয়ে দেব।

ছোট ভাইকে নিয়ে আমেদাবাদে এলেন সত্যেন্দ্রনাথ। তাঁর স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী দেবরটিকে খুবই স্নেহ করতেন। তবে জ্ঞানদানন্দিনী পুত্রকন্যাদের নিয়ে বিলেতে ছিলেন। ফলেই মেজদার কাছে রবীন্দ্রনাথকে একলাই থাকতে হয়েছিল। সত্যেন্দ্রনাথ দুপুরে আদালতে চলে যেতেন। তখন শাহি আমলের নির্জন বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের দিন কাটত মেজদাদার লাইব্রেরিতে। সারাদিন ইংরেজি পড়েন। অভিধানের সাহায্যে বুঝতে চেষ্টা করেন। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে লেখা চলেছে ভারতীর জন্য — কবিতা নয়, প্রবন্ধ। (যেখানটা বুঝতে পারতেন না, কল্পনার সাহায্যে তার অর্থটা পূরণ করে নিতেন।)

মৌলিক রচনা নয়, ইংরেজির তর্জমা। নির্জন বাড়ির ছাদে একা একা ঘোরেন, মনের মধ্যে নানা রকম কল্পনা, ভেসে আসে গানের সুর, কথা যেন নিজের মনে। কবিতা যা লেখেন তার মধ্যে ইংরেজি, সংস্কৃত ও মারাঠি থেকে তর্জমাই বেশি।

ইংরেজি শিখছেন, কিন্তু বলা-কওয়ার অভ্যেসটা হচ্ছে না। একা-একা তো বলা-কওয়ার অভ্যাস হয় না। এটা লক্ষ্য করলেন সত্যেন্দ্রনাথ। ঐ বয়সী রবি যাতে স্বচ্ছন্দভাবে কথাবার্তা বলতে পারে এবং বিলেত গিয়ে ওই ব্যাপারে যাতে কোনো অসুবিধা না হয় সেজন্য তিনি রবিকে পাঠিয়ে দিলেন বোম্বাইতে তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে। এই পরিবারের ইংরেজি আলাপ খুব প্রচলিত। ইংরেজি বলা-কওয়াটা যখন বেশ রপ্ত হলো তখন সত্যেন্দ্রনাথ লম্বা ছুটি নিয়ে বিলেত গেলেন। রবীন্দ্রনাথ সেজদাদার সঙ্গে চললেন। তখন তাঁর বয়স সতেরো বছর। বাহিরে, দূরের অভিজ্ঞতা এই প্রথম।

ইংল্যান্ডে পৌঁছে তাঁরা সোজা গেলেন ব্রাইটনে, যেখানে সত্যেন্দ্রনাথের পরিবারবর্গ থাকেন। কলকাতা ছেড়ে অনেক দিন পরে স্বজনের মুখ দেখে রবীন্দ্রনাথের সে কী আনন্দ — যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন তাঁদের সঙ্গে আত্মীয়স্বজন পরিবারের মনে। ছোট্ট সুরেন ও বোন ইন্দিরাকে পেয়ে তাঁর মন খুব খুশি হলো। ব্রাইটনের এক পাবলিক স্কুলে তাঁকে ভর্তি করে দেওয়া হলো। ব্রাইটন আসলে মফঃস্বল জায়গা, স্কুলটিও মফঃস্বলের স্কুল। এখানে থাকলে বিলেতের শিক্ষা পাওয়ার কোনো সুযোগ হবে না। তখন তাঁর বন্ধু, ব্যারিস্টার তারকনাথ পালিতের অনুরোধে সত্যেন্দ্রনাথ ভাইকে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজে ভর্তি করে দিলেন। এখানে রবীন্দ্রনাথ সহপাঠী হিসেবে পেলেন লোকেন পালিতকে। লোকেন তাঁর দাদার বন্ধুর ছেলে।

পরবর্তী কালে সিভিলিয়ান লোকেন পালিত কবির অন্তরঙ্গ বন্ধুদের অন্যতম ছিলেন। শুধু তাই নয়। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রসাহিত্যের একজন সমঝদার সমালোচক ও অনুরক্ত বন্ধু।

এক ইংরেজ গৃহস্থের বাড়িতে বোর্ডার হিসাবে থাকার ব্যবস্থা হলো। ভদ্রলোকের নাম স্কট। অল্পদিনের মধ্যে নিজের আচরণের গুণে রবীন্দ্রনাথ এই স্কট পরিবারের পরম আত্মীয়ের মতো হয়ে উঠেছিলেন। কলেজে ইংরেজি পড়াতেন হেনরী মর্লি; ইনি সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক জন মর্লির ভাই। জন মর্লি কিছুকাল ভারত সচিবের পদে নিযুক্ত ছিলেন। অধ্যাপক হেনরী মর্লির পড়ানোর পদ্ধতি, তাঁর স্নেহ ও শাসন, রবীন্দ্রনাথকে খুব মুগ্ধ করে। এই অধ্যাপকের স্মৃতি তাঁর জীবনে চিরকাল অম্লান ছিল। রবীন্দ্রনাথ যখন বিলাতে ছাত্রজীবন অতিবাহিত করেন তখন, ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন গ্ল্যাডস্টোন।

১ মহারানি ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকাল এবং

কলেজে অধ্যয়নের সঙ্গে তরুণ কবির সাহিত্যচর্চার বিরাম ছিলনা। বিলাতের বিচিত্র অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে ভারতীতে তিনি ধারাবাহিক লেখা পাঠাতেন প্রায় প্রতি মেলে। এই পত্রগুচ্ছগুলি শেষ হওয়া কয়েক বছর পরেও উপভোগ্য ছিল। দেড় বছর বিলাতে থেকে, কোনো বিদ্যা আয়ত্ত না করে, কোনো ডিগ্রী না নিয়ে, এমন কি ব্যারিস্টারি পড়া শেষ না করেই রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরলেন — তখন তাঁর বয়স বছর উনিশ। [illegible] ফিরে আসার [illegible] তাঁর সঙ্গে [illegible] ছিলেন। বিলেতে গিয়েছিলেন লাজুক নম্র বালক, ফিরলেন প্রগল্‌ভ যুবক। সুন্দর স্বাস্থ্য, রঙ আরো ফুটফুটে হয়েছে।

১ এইগুলি পরে 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' নামে বই আকারে ছাপা হয়।

প্রায় দু বছর পরে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ফিরলেন রবীন্দ্রনাথ।

ওঁকে অভ্যর্থনা জানালেন স্বর্ণকুমারী দেবী। দেশে ফিরে দেখেন বাড়িতে তৈরি শুনলেন জ্যোতিদাদা 'মানময়ী' নাটক লিখেছেন, তারই অভিনয়ের আয়োজন চলছে। উৎসাহে লুফে নিলেন রবীন্দ্রনাথ; নাটকের জন্য একটা গানও লিখে দিলেন এবং মদনের ভূমিকায় অভিনয় করলেন।

আগেই বলেছি, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে তখন ও অভিনয়ের নিয়মিত চল-চলন হাওয়া ছিল; শহরের গণ্যমান্য লোকেরা আমন্ত্রিত হতেন। এই উপলক্ষে বছরে একটা করে সাহিত্য উৎসব হতো। রবীন্দ্রনাথ যে বছর বিলেত থেকে ফিরলেন সে-বছরের সাহিত্য সম্মিলনে একটা নাটক অভিনয়ের কথা হলো। বড়োদের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন সেই নাটক — 'বাল্মীকি প্রতিভা'। অভিনয় হলো ঠাকুরবাড়িতেই, নাট্যকার স্বয়ং সাজলেন বাল্মীকি। পরের যুগে রবি অভিনয়কলায় যে অসামান্যতা দেখান তার উন্মেষ দেখা গিয়েছিল এই ছোট্ট নাটিকা-অভিনয়ের দিন।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই ঘটনা স্মরণীয় হয়ে আছে, একটা কারণে। অতিথিদের বৈঠকে নিমন্ত্রিতদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। এভাবে জীবন কাটাতে পারলে মন্দ হতো না। এই সময়ে একদিন মুসৌরি থেকে পিতার নির্দেশ এলো— রবিকে আবার বিলেতে গিয়ে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরতে হবে। এবার সঙ্গে চলেছেন ভাগ্নে সত্যপ্রসাদ। কিন্তু মাদ্রাজ পর্যন্ত গিয়ে দুজনেরই মত বদলালো। দুজনেই ফের ফিরে এসে কর্তাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে মুসৌরি গেলেন। দেবেন্দ্রনাথ কিন্তু আর কোনো জিদ করলেন না।

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ 'ভগ্নহৃদয়' ও 'রুদ্রচণ্ড' নামে দুখানা কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন; প্রথমটি উৎসর্গ করলেন তাঁর বৌঠান কাদম্বরী দেবীকে — দেবরকে যিনি লালন করেছেন তাঁর অন্তঃকরণের সমস্ত স্নেহ দিয়ে এবং যিনি ছিলেন 'রবীন্দ্রনাথের জীবন কল্যাণী ধ্রুবতারার মতো নিঃশব্দ, নির্নিমেষ।' দ্বিতীয় কাব্যটি উৎসর্গ করলেন তাঁর জ্যোতিদাদাকে। তরুণ কবির 'ভগ্নহৃদয়' কাব্য পাঠ করে ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর কবিকে অভিনন্দিত করেছিলেন। ঐ পত্রে ছিল আশাতীত পুরস্কার। এই কৃত-পরিবারের সঙ্গে পরবর্তীকালে কবির সম্পর্ক নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল এবং 'কবি' শেষ জীবনে ত্রিপুরা দরবার থেকে তিনি শেষ সম্মান পান — 'ভারতভাস্কর' — তারই সূচনা ছিল এই উপাধি।

মুসৌরি থেকে ফিরলেন কলকাতায়। জোড়াসাঁকোর বাড়ির আত্মজনের মধ্যেও তাঁর স্থান আর নেই। দিনগুলি কাটে বৈচিত্র্যহীন ভাবে। একেবারে সঙ্গীহীন হয়ে পড়েছেন। এই নিঃসঙ্গ অবস্থায় কাব্যধারা অবচেতন এক নূতন পথে প্রবাহিত হয়। এই কবিতাগুলিই 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' যা পাঠ করে বঙ্কিমচন্দ্র তরুণ কবিকে 'বিধাতার সৃষ্টি' বলে অভিনন্দিত করেছিলেন। এই কাব্যে এক বিপুল সম্ভাবনার মহিমা যেন উদ্ঘাটিত হয়ে উঠল:

জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
ওরে উথলি উঠেছে বারি;
ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ
রুধিয়া রাখিতে নারি।

কবিতা নয় — এ যেন নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ। রবীন্দ্রনাথের নিঃসঙ্গ জীবনের শিয়রদেশে

এতদিনে

ফুটে উঠল কবিতারা। আত্মপ্রকাশের উৎকণ্ঠা। যুক্ত হলো নূতন ছন্দ, হলো তাঁর অনিশ্চিতের আকাঙ্ক্ষার উন্মোচন। জেগে উঠলো তাঁর কল্পনাবোধ। প্রকৃতি ফিরলো হাসি ছড়িয়ে দিয়ে। নিখিল ভুবনে তিনি ঢাললেন তাঁর প্রাণ ঢেলে দিলেন। বললেন:

এত কথা আছে, এত গান আছে,
এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে –
প্রাণ হয়ে আছে ভোর।

সেই তাঁর কথা, গান আর সমস্ত সাহিত্যকর্ম দীর্ঘস্থায়ী কালের ইতিহাসই রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রকৃত ইতিহাস

space

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন কুড়ি বছর। লিখলেন সেই বয়সে একটি উপন্যাস – 'বৌঠাকুরানীর হাট'। বঙ্কিমচন্দ্র বইটি পাঠ করে, প্রশংসা করে লিখে দিলেন নবীন লেখককে যাঁর মধ্যে তিনি একটি প্রতিভার সন্ধান পেয়েছিলেন। আরো দু'বছর কেটে গেল নানা বিষয়ে সাহিত্যচর্চার ভেতর দিয়ে। বাইশ বছর বয়স হলো। এই সময়ে তিনি কিছুদিন তাঁর মেজদার সঙ্গে বোম্বাই প্রদেশের কারোয়ারে বাস করেন; তাঁর সঙ্গে ছিলেন, তাঁর জ্যোতিদাদা ও বৌদি। কারোয়ার কর্ণাটের প্রধান শহর, সমুদ্রের ধারেতে অবস্থিত। অতি মনোরম স্থান। এই প্রবাস-জীবনেও সাহিত্যচর্চা চলেছিল অবাধে – কবিতা, গান, নাটক ও প্রবন্ধ সবই লিখেছেন। এখানে বসে তিনি লিখেছিলেন 'প্রকৃতির প্রতিশোধ', কবির হাতের প্রথম নাটক যা গানের সুরে ঢালা নয়।'

প্রথম

খেলে ও মেলে, সুখে দুঃখে ও দেহমনে রবীন্দ্রনাথের, যেখানে তিনি কবির মতো। তাঁর সমস্ত প্রাণ দিয়ে মন কাদম্বরীর প্রতি উন্মুখ পড়লো। ১৮৮৩, ডিসেম্বর ৯। কবির জীবনের একটি অবিস্মরণীয় তারিখ। তিনি সংসার-জীবনে প্রবেশ করলেন। বিয়েটা হলো হঠাৎ। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির বংশধর, দেশবরেণ্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরম গৌরব পুত্র রবীন্দ্রনাথের বিয়ে হলো এক অখ্যাত ও সাধারণ পরিবারের মেয়ের সাথে। ঠাকুরবাড়ির জমিদারীর এক অতিসাধারণ কর্মচারীর কন্যা, বারো বছর বয়সের মেয়ে।

মেয়ের নাম ভবতারিণী, দেবেন্দ্রনাথ পুত্রবধূর নাম বদল করে রাখলেন মৃণালিনী — ঠিক যেমনটি হয়েছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিয়ের সময়, কাদম্বিনী হয়েছিলেন কাদম্বরী। মেয়ের বাবা খুলনার পিরালী ব্রাহ্মণ। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব-পুরুষেরা ছিলেন তাই। বিয়ে হলো জোড়াসাঁকোর বাড়িতে — খুব ঘটা করেই কনিষ্ঠপুত্রের বিয়ে দিলেন দেবেন্দ্রনাথ। এই বালিকা বধূকে শিক্ষা দীক্ষা দিয়ে বাড়ির আর সব বৌদের মতো করবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি ছিলনা। এই ভার অনেকটা নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজে। তিনি যেমন স্নেহশীল তেমনি কর্তব্যপরায়ণ স্বামী ছিলেন।

বিয়ের পাঁচমাস পরের কথা। একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে যায় পরিবারে — যেন একটা বড় ঝড়ের মত বয়ে যায়। কাদম্বরী দেবী হঠাৎ আত্মহত্যা করলেন। আঘাতটা সবচেয়ে প্রবল হয়েছিল তাঁর স্নেহের দেবরটির উপর। তাঁর কবিজীবনের সঙ্গী ছিলেন তাঁর বৌঠান; তাঁকে তিনি কতটা শ্রদ্ধা করতেন তার পরিচয় রয়েছে কাদম্বরী দেবীর উদ্দেশে লেখা অসংখ্য গান ও কবিতার মধ্যে।

দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের প্রধান, আদি ব্রাহ্ম সমাজের নেতা। এখন তাঁর বয়স হয়েছে; সমাজের কাজকর্ম দেখতে পারেন না। তাই, একদিন তিনি রবীন্দ্রনাথকে তাঁর কাছে ডেকে বললেন, রবি, তোমাকে সমাজের সম্পাদক পদে নিযুক্ত করলাম আর কিছুদিন তত্ত্ববোধিনী কাগজের সম্পাদক করলাম। যেমন কাব্য ও সাহিত্যের সাধনার ছেদ পড়ল; রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক হয়ে সমাজের কাজ ভালো ভাবে মন দিলেন। বাইরে সমাজের কাজ করেন, ঘরের কোণে নতুন বন্ধুগোষ্ঠীদের নিয়ে চলে সাহিত্যের আড্ডা। এই সময় বেরোলো তাঁর নূতন কাব্যগ্রন্থ কড়ি ও কোমল।

ঠাকুরবাড়িতে এখন অনেকগুলি শিশু ও বালক। কয়েকজন এদের মধ্যে বড় হয়ে উঠেছে। সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য কলিকাতায় এসে আছেন। এইসব ছেলেদের জন্য তিনি 'বালক' নামে এক মাসিক পত্রিকার প্রকাশ করলেন। তিনি বেশ ভালো করেই জানতেন কাগজের সম্পাদনা তিনি করলেও এর আসল কাজ যোগাবেন তাঁর কনিষ্ঠ দেবর রবি। হলোও তাই। রবীন্দ্রনাথের কর্মহীন জীবনে একটা কাজ জুটল। ছেলেদের জন্য লিখতে লাগলেন গল্প উপন্যাস, নাটক, কবিতা, ভ্রমণকাহিনী — এমনি কত বিচিত্র রচনা তাঁর লেখনী থেকে বেরুতে থাকে। সবাই বিস্মিত হয়। একদিকে 'বালক', অন্যদিকে ভারতী — দুটি কাগজেই লিখে চলেছেন অক্লান্তভাবে। বাংলা-সাহিত্যে যা ছিল না — সেই হাস্যকৌতুক, ব্যঙ্গকৌতুক পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ এই সময় আমদানী করেছিলেন। 'বালক' পত্রিকার পৃষ্ঠায় তাঁর বিখ্যাত রচনা, ত্রিপুরা রাজবংশের কাহিনী নিয়ে 'রাজর্ষি' উপন্যাস। পরে এই উপন্যাসের কথাবস্তু নিয়ে তিনি 'বিসর্জন' নাটক লিখেছিলেন।

#space#

~~[illegible]~~

হয়েছে। কলকাতার রাজনৈতিক জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে এই বছরটি ভারতের জাতীয় মহাসভার অধিবেশনের জন্য। মহাসভার জন্ম হয় মাত্র এক বছর আগে বোম্বাই শহরে। দ্বিতীয় অধিবেশন হলো কলকাতায়। মহাসভার নেতাদের কাছ থেকে, গান এলো গান লিখে দিতে হবে। লিখলেন সেই বিখ্যাত গানটি — 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে'। অনুষ্ঠানে গান সেটা গাইতে হবে। শ্রী ও আত্মবিশ্বাসের প্রতিমূর্তি রবীন্দ্রনাথ মঞ্চে মহাসভার মঞ্চ থেকে গাইলেন অর্থস্পর্শী সুরে সঙ্গে তখন শ্রোতাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় তাঁর ওপর। ঠাকুরবাড়ির বাইরে বিপুল জনসমাবেশের সামনে সেই তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ। এর ঠিক পঁচিশ বছর বাদে ১৯১১ সালে জাতীয় মহাসভার যে অধিবেশন হয় কলকাতায় তার জন্য তিনি রচনা করে দিয়েছিলেন 'জনগণমন-অধিনায়ক' গানটি — যা আজ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' গানের সঙ্গে সমান মর্যাদা পেয়েছে।

১৮৮৮

দেবেন্দ্রনাথের বয়স হচ্ছে। তিনি দেখলেন, রবিকে দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের মধ্যে টানতে না পারলে আর চলবে না। তাঁদের ছিল বিরাট জমিদারি। তা জমিদারির দায়িত্ব ছেলেদের হাতেই তো দেখতেই হবে। দ্বারকানাথের পর দেবেন্দ্রনাথ জমিদারি তিনিই চালিয়ে এসেছেন। ছেলেদের মধ্যে, তিনি দেখলেন, এক রবি ছাড়া জমিদারি দেখবার ছেলে কেউ নেই। কিন্তু তার শিখতে হবে। অতএব গুরুর হুকুম হলো, এখন থেকে তাঁর কনিষ্ঠপুত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে জমিদারির কাজ দেখবার জন্য প্রথমে কলকাতার সেরেস্তায় বসতে হবে। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ একটি কন্যাসন্তানের পিতা হয়েছেন। মেয়ের নাম রেখেছেন বেলা।

রবীন্দ্রনাথ কাব্যরচনা একটু শিথিল করে, জমিদারির কাজে মনোনিবেশ করলেন। বুদ্ধি ছিল প্রখর, কাজ শিখতে বেশি সময় লাগলনা। কয়েকদিন বাদে বাবার কাছে এসে বললেন, বাবা, কাজ শেখা হয়েছে। তখন দেবেন্দ্রনাথ ছেলেকে দু একটা প্রশ্ন করে বুঝলেন যে, রবি বৈষয়িক কাজের খাতা নিখুঁত, আয়ত্ত হয়েছে। বললেন, দেখো, কিন্তু মনে জমিদারির কাজ দেখতে গিয়ে দান করে, প্রজার খাজনা মকুব করে, লোকসান ঘটিয়ে যেন ফিরে আসতে না হয়। উত্তরবঙ্গে আর শিলাইদহে আমাদের জমিদারি আছে। তোমাকে এখন সেইখানে গিয়ে থাকতে হবে।

শুরু হয় কবির জীবনে এক নতুন অধ্যায়।

কবি রবীন্দ্রনাথ দেখা দিলেন জমিদার রবীন্দ্রনাথ রূপে।

পিতার কাছ থেকে যথাযথ উপদেশ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের শিলাইদহের জমিদারির উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন। পদ্মার তীরে শিলাইদহ। জীবনের নূতন অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রবেশ করলেন। জমিদারির কাজ সেরেও কাব্যচর্চার অবসর পেলেন। নতুন পরিবেশে নতুন রচনা লেখার প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন প্রচুর। এই প্রেরণা নিয়েই তো তিনি লিখেছিলেন। শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে রাত্রির নিস্তব্ধ প্রহরে বসে লিখেছিলেন 'বিসর্জন' নাটক। তাঁদের একটা হাউসবোট ছিল। মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে থাকতেন।

তোমরা হয়ত ভেবে আশ্চর্য হবে কবি রবীন্দ্রনাথ কেমন করে নিজেকে জমিদারি পরিচালনার মতো নীরস কাজে খাপ খাওয়াতে পেরেছিলেন। আসল কথা তাঁর মনের গঠনটাই ছিল অন্য রকমের। তিনি একই সঙ্গে ভাবের জগতে ও বস্তুর জগতে বাস করতে পারতেন — যেমন ছিলেন জনক রাজা। তিনি একই সঙ্গে রাজকার্য করেছেন আবার

প্রশংসিত করেছেন। সকালে ও বিকেলে জমিদারির আমলারা আসতেন নানা বৈষয়িক ব্যাপার নিয়ে। প্রজারা আসত তাদের অভাব অভিযোগ নিয়ে। মামলা-মোকদ্দমার নথিপত্রও তাঁকে দেখতে হতো, আবার অতিথি-অভ্যাগতদের আলাপ আলোচনায়ও যোগ দিতেন তিনি। রোজ খুব ভোরে উঠে উপাসনা ও সামান্য জলযোগ সেরে বেড়াতে বেরোতেন মাঠের মধ্যে একাকী। মাঠে, তবে তাঁর কাছ থেকে অনেক দূরে, থাকত অনুবর্তী, চাকর বরকন্দাজ। দু'তিন ঘণ্টা বেড়াতেন। প্রজাদের 'সেলাম হুজুরের' উত্তরে তাদের সাথে নানা আলোচনায় রত হতেন, তাদের সুখদুঃখের কথা শুনতেন। কুঠিবাড়িতে ফিরতেন বেলা নয়টা নাগাদ। তখন বসত আমলা ও প্রজাদের দরবার। দিনে ঘুমুতেন না।

যখন ঘরে বসে লেখার কাজে মন বসত না আশ্রয় নিতেন পদ্মার বুকে। ঘরের মতো করে সুন্দর সুসজ্জিত জলযান, ইংরেজিতে যাকে বলে 'হাউসবোট', তৈরি করিয়েছিলেন। দাঁড়িমাল্লা বাদেও 'সব সময়ের জন্য দুজন [illegible] বরকন্দাজ সাথে থাকত। থাকত বাবুর্চি ও নফর। যে ঘাটে বোট বাঁধা থাকত সেখানে প্রায় সারাদিন গাঁয়ের মেয়েদের আনাগোনা। কবি ঘরে বসে শুনতেন তাদের আলাপ বিলাপ। সাহিত্যরচনার প্রেরণা যখন জেগে উঠত তখন দিন পর দিনের জন্য পদ্মার কোনো জনহীন কোলের মধ্যে বোট বাঁধা থাকত। হুকুম ছিল সেই সময়ে কেউ যেতে পারবে না। জ্যোৎস্না রাতে প্রায়ই পদ্মার চরে ঘুরে বেড়াতেন। প্রায়ই গ্রাম-গ্রামান্তরে বেরোতেন। এইভাবে, অনেক কুড়ি বছর জমিদারি পরিচালনা করে, রবীন্দ্রনাথ যেমন আদর্শ জমিদাররূপে যে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন তাতে দেবেন্দ্রনাথ তার প্রশংসা করেছেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে তাঁর বিপুল সাহিত্যকর্মের জন্য। ঐ ঠাকুরবাড়ি থেকে বলেন্দ্রনাথ 'সাধনা' নাম দিয়ে একখানি মাসিক পত্র বের করেছেন। বলেন্দ্রনাথ তাঁর চতুর্থ অগ্রজ বীরেন্দ্রনাথের পুত্র। কবি নিজেই লিখেছেন: 'সাধনা থেকে শুরু করে [illegible] আমার সাহিত্যের [illegible] নাই।' কাবুলিওয়ালা, [illegible], ক্ষুধিত পাষাণ, প্রভৃতি বিখ্যাত ছোটগল্পগুলি রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে বসেই রচনা করেছিলেন। তেমনি চোখের বালি, গোরা উপন্যাস, গীতাঞ্জলি, [illegible], [illegible] প্রভৃতি কাব্যের অনেকগুলি কবিতা তিনি এখানে বসে লিখেছিলেন। [illegible] ও [illegible]। এইভাবে কবির যৌবন ও প্রৌঢ় বয়সের সাহিত্যরস-সাধনার [illegible] হয়ে উঠেছিল পদ্মার তরঙ্গ-বিধৌত শিলাইদহ পল্লী। এই পদ্মার সঙ্গে তাঁর [illegible] কবি নিজেই বলেছেন: 'হে পদ্মা আমার / তোমায় আমায় দেখা [illegible]।'

[illegible] শিলাইদহেই রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন বাংলার নদী, প্রকৃতি, [illegible] সান্নিধ্য। পেয়েছিলেন বাংলা মায়ের কোলের সন্তানদের নিবিড় সান্নিধ্য; [illegible] নিবিড় সংস্কৃতি ও জীবনধারার আসল পরিচয়। এই কথার [illegible], বাংলার [illegible] ঐশ্বর্য, সম্পদ, প্রকৃতি তাঁকে দিয়েছিল পল্লীবাংলার যথার্থ পরিচয়। [illegible] এখানেই পল্লীবাংলার ঐশ্বর্য কাব্যচিত্র, মাঠ, ঘাট, বন, কৃষকের [illegible] দেখে মুগ্ধ হয়ে লিখেছিলেন:

[illegible] দুলে [illegible] গান
[illegible] হয়ে কী [illegible]।

॥ চার ॥

দিগন্ত প্রসারিত ভুবনডাঙার মাঠ।

এইখানে শান্তিনিকেতন স্থাপন করেছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

এই শান্ত পরিবেশে তিনি একদিন পেতেছিলেন তাঁর ধ্যানের আসন। এইখানেই বাল্যে রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব রচনায় প্রথম হাতেখড়ি। একদা সেই জনশূন্য মাঠে দুটি ছাতিম গাছের তলায় নির্জন সাধনায় মগ্ন মহর্ষিদেব খুঁজেছিলেন প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ আর আত্মার শান্তি। এইখানেই দিনের পর দিন, মাসের পর মাস তিনি অর্ঘ্য দিতেন ঈশ্বরের উপাসনায় [illegible]।

দেবেন্দ্রনাথ যেখানে যে সাধনার বীজ বপন করেছিলেন, তারই ফলে রুক্ষ [illegible] লাল কাঁকর-বিছানো সেই রুক্ষ মরুপ্রান্তর আজ পুণ্যতীর্থে পরিণত হয়েছে। [illegible] শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রনাথ একাধারে [illegible] জীবনের সমস্ত ধ্যান ও সাধনা এই পুণ্যতীর্থকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। [illegible] কল্পনাকে রূপ দিলেন পুত্র। দেবেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে আশ্রম প্রতিষ্ঠা ও মন্দির স্থাপন করেছিলেন। এর বেশি তখন কিছু হয়নি। ১৩০৮, ৭ই পৌষ। রবীন্দ্রনাথ [illegible] একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন। স্কুলের নাম দিলেন বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম। বিদ্যালয়ের [illegible] হলেন প্রথমে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। এঁর আসল নাম ছিল ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। [illegible] আধ্যাত্মিক সন্ন্যাসী ছিলেন। তেমনি নির্ভীক দেশপ্রেমিক ছিলেন ইনি। মাত্র দুটি ছাত্র নিয়ে [illegible] হয় স্কুলের কাজ। এই স্কুলের ইতিহাস কবি স্বয়ং এই ভাবে বর্ণনা করেছেন:

"শিলাইদহে পদ্মাতীরে সাহিত্যচর্চা নিয়ে নিভৃতে বাস করতুম। [illegible] সৃষ্টির সংকল্প নিয়ে সেখান থেকে এলেম শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে। তখন আশ্রম পরিধি ছিল ছোটো। তার দক্ষিণ সীমানায় দীর্ঘ সারবাঁধা শালগাছ। মাধবী[illegible] প্রবেশের দ্বার। পিছনে পূর্ব দিকে আমবাগান, পশ্চিম দিকে কোথাও [illegible]

কোথাও বা জাম, কোথাও বা মাঠ। ইতস্ততঃ দুটি একটি নারিকেল। উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে প্রাচীন দুটি ছাতিমের তলায় মার্বেল পাথরে বাঁধানো একটি নিরলংকৃত বেদী। তার সামনে গাছের আড়াল নেই, দিগন্ত পর্যন্ত অবারিত মাঠ, সে-মাঠে তখনো চাষ পড়েনি। উত্তরদিকে আমলকী বনের মধ্যে অতিথিদের জন্য দোতলা বাড়ি। আর তারি সংলগ্ন রান্নাবাড়ি প্রাচীন কদম গাছের ছায়ায়। আশ্রমের বাইরে দক্ষিণের দিকে বাঁধ তখন ছিল বিস্তৃত আর জলে ভরা। তার উত্তরের উঁচু পাড়িতে বহুকালের দীর্ঘ তাল শ্রেণী। পূর্ব সীমানায় বোলপুরের দিকে ছায়াশূন্য রাঙামাটির রাস্তা গেছে চলে। চারদিকে বিরাট অবারিত বিপুল অবকাশ, নীরব নিস্তব্ধতা।

'আশ্রমের রক্ষী ছিল বৃদ্ধ দ্বারী সর্দার। মস্ত দীর্ঘ সনলম্ব তার দেহ। হাতে তার লম্বা পাকা বাঁশের লাঠি, প্রথম বয়সে দস্যুবৃত্তির শেষ নিদর্শন। মালী ছিল হরিশ, দ্বারীর ছেলে। আমি সঙ্গীদের আশ্রয় নিয়েছিলুম দোতলার ঘরে। এই শান্ত জনবিরল শালবাগানে অল্প কয়েকটি ছেলে নিয়ে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সহযোগে বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ করেছিলুম। আমার পড়াবার জায়গা ছিল প্রাচীন জামগাছের তলায়।'

জমিদার রবীন্দ্রনাথ হলেন শিক্ষাব্রতী।

প্রাচীন ভারতের তপোবনের আদর্শে স্থাপিত এই বিদ্যালয়টি ছিল কবির প্রাণপ্রতিম। গড়ে তুলবার জন্য কত পরিশ্রম, কত ত্যাগ স্বীকার, কত [illegible] যে তিনি করেছেন তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। তখন গল্প উপন্যাস লিখে তিনি যা টাকা পেতেন তার সবটাই স্কুলের জন্য খরচ করতেন। অর্থেরও সংগতি তখন তাঁর বিশেষ কিছু ছিলনা। তাকেই খুব সাবধানভাবে স্কুল চালাতে হতো তাঁকে। আড়ম্বরের চেয়ে আদর্শ

তখন অনেক বড়ো ছিল। ভারতের প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে কবি দেখেছিলেন বিস্তৃত তপোবনের চিত্র। সে-চিত্র কল্যাণের নির্মল সুন্দর আনন্দমূর্তি, বিলাস-মোহমুক্ত কল্যাণ আনন্দের স্ফূর্তি। ভোগৈশ্বর্যে কালে বিকারিত এই আধুনিক যুগে তপোবনের উপকরণ বিরল শান্ত সুন্দর আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়—তবুও একটা বড়ো রকমের পরীক্ষা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। শুধু যে জমিদারি ঘরে বসে আর শান্তি তপোবন চলতো তা নয়। গাড়ি ঘোড়া আলো পাখারও কোনো সমারোহ ছিল না। খুব বেশি দূরে হলে বা অন্য কারণে যাদের দরকার হতো গরুর গাড়ি ছিল সম্বল। তখন স্কুলের মাটির ঘরে জ্বলতো লণ্ঠনের আলো, এমন কি কবির ঘরেও ছোট একটা কেরোসিনের আলো সারা রাতই জ্বলতো। বোলপুর গরমের দেশ, কিন্তু তারা হাতেই পাখা চালাতো না। রবীন্দ্রনাথ হাতপাখাও সরিয়েছেন। তেমনও শুনেছি অনেক সময় যে স্কুলের আলোর জন্য কেরোসিন কেনবার পয়সা না থাকায় কবি নিজেই কেরোসিন কিনে দিয়েছেন।

কল্পনা-বিলাসী কবিমাত্র তিনি যে নন, তাঁর এই দুঃসাহসিক প্রয়াসই তার প্রমাণ। তবি [redacted] এখানে সেবারে কর্মী এবং আচার্য। এমন আর এক রবীন্দ্রনাথ। শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই আছে রবীন্দ্রনাথের নিত্য পরিচয়। তেপান্তর না জানলে রবীন্দ্রনাথকে পুরোপুরি জানা যায় না। স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন। তিনি নিজেই পড়াতেন ছাত্র-ছাত্রীদের আর নিজেই সব দেখাশোনা করতেন। কবি এমন খেলার সঙ্গীও ছিলেন। ছাত্রদের পরিচর্যার ভার ছিল কবিপত্নী মৃণালিনী দেবীর উপর। তিনি নিজের হাতে রেঁধে দিনের পর দিন সকলকে খাইয়েছেন। এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার এক বছর পরেই তাঁর মৃত্যু হয়।

যে বলে তাঁকে। আড়ম্বরের কোনো আড়

স্কুলে প্রথম প্রথম ছাত্র ছিল কয়েকটি মাত্র। ক্রমশ তাদের সংখ্যা বেড়ে চললো। তারপর দশ-পনেরো বছরের মধ্যে দেশ-বিদেশ থেকে শত-শত ছাত্র-ছাত্রী এলো এইখানে শিক্ষালাভ করতে। প্রাচীন ভারতের তপোবন যেন এই বিংশ শতাব্দীতে সেখানে গড়ে উঠলো। খেলাধূলো আর গল্পগানের ভিতর দিয়ে লেখাপড়া — এ এক নূতন পরীক্ষা বৈ কি। ছেলেরা খোলা মাঠে ছুটোছুটি করে বেড়ায়, গাছের ছায়ায় বসে লেখাপড়া করে। শিক্ষকদের সঙ্গে ওরা মেশে প্রাণ খুলে। শান্তিনিকেতনের এই অখণ্ড আনন্দের ছবি আমরা পাই কবির একটি গানে। গানটি এই :

আমাদের শান্তিনিকেতন,
আমাদের সব হতে আপন।
তার আকাশ-ভরা কোলে
মোদের দোলে হৃদয় দোলে,
মোরা বারে বারে দেখি তারে নিত্যই নূতন॥
মোদের তরুমূলের মেলা,
মোদের খোলা মাঠের খেলা
মোদের নীলগগনের সোহাগ-মাখা সকাল-সন্ধ্যাবেলা।
মোদের শালের ছায়াবীথি
বাজায় বনের কলগীতি
সদাই পাতার নাচে মেতে আছে আমলকি কানন॥

শান্তিনিকেতনের আবহাওয়া ছাত্রদের সাহিত্যের দিকে টেনে নিয়ে যেত,

দিয়ে নূতন করে ওদের গড়তে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর স্কুলে ছেলেরা প্রাণময়ী প্রকৃতিকে পেয়েছে খেলাধুলায়, পেয়েছে গানের মধ্যে। মানুষের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার সঙ্গে প্রকৃতির সান্নিধ্যকে মধুর ও আন্তরিক করে তোলাই ছিল কবির শিক্ষার প্রধান আদর্শ।

লেখাপড়ার সঙ্গে চলতো সাহিত্যচর্চা, সঙ্গীত-নৃত্য, আর আবৃত্তি অভিনয়। সাহিত্য-সভা ছিল শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের জীবনের একটি অঙ্গ। ফুল লতাপাতা দিয়ে সাজিয়ে ছেলেরা নিজেদের রচনা পড়তো, নূতন লেখা গান গাইতো। যখন তখন রবীন্দ্রনাথ স্কুলের ছেলেদের নিয়ে সাহিত্যসভা করতেন, সাপ্তাহিক উপাসনা করতেন। সে এক সুন্দর, সহজ পরিবেশ। কবির কাব্যজগতের চারদিকে সারাদিন ঘিরে থাকত এই ছেলেরা — এদের সঙ্গে থেকে অনেক কবিতা রচনা করেছেন। কবি দিতেন ওদের উৎসাহ। ছেলেদের দেখে ওঁর মনে বিশ্বপ্রাণের স্পন্দন লাগতো।

শান্তিনিকেতনের স্কুলে ছেলেদের মাইনে খুব কম ছিল। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যেসব শিক্ষক এখানে কাজ করতে আসতেন তাঁদের অনেকেই বেতন নিতেন না; যাঁরা নিতেন তাঁরা যৎসামান্য নিতেন। এই স্কুল চালাবার জন্য, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলেছেন, তিনি কারো কাছে হাত পাতেননি। এজন্য তাঁকে ঋণগ্রস্ত হতে হয়েছিল, এমন কি মৃণালিনী দেবীর গহনা পর্যন্ত বিক্রী করতে হয়েছিল। এই ১৯১৩ সালে কবি যখন নোবেল পুরস্কার পেলেন তখন ওর সব টাকাই তিনি বিদ্যালয়কে দান করেন। একবার স্কুলের একটি ছাত্রকে কবি এক চিঠিতে লিখেছিলেন: 'তোমাদের সকলের সম্মিলিত শক্তির দ্বারাই আমাদের আশ্রমজীবনের [redacted] ঘটিবে। এই আশা একান্ত আশা করি।' তাঁর স্কুলে ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে যে মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা এখনকার দিনে দুর্লভ।

উদ্বোধন

সতেরো বছর পরে শান্তিনিকেতনের সেই ব্রহ্মচর্যাশ্রম পরিণত হল বিশ্বভারতীতে। ১৯১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে [redacted] কবি প্রতিষ্ঠা করলেন তাঁর

জীবনের মহত্তম কীর্তি – বিশ্বভারতী। শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়কে সর্বভারতীয় একটি শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে রূপ দিতে গিয়ে কবি সেদিন বলেছিলেন; 'শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগের সূত্র করে তুলতে হবে। এখানে সর্বজাতিক মনুষ্যত্ব-চর্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। স্বাজাতিক সংকীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আসছে। এখন প্রয়োজন বিশ্বজাতিক মহামিলন যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা। এর প্রথম আয়োজন বোলপুরের প্রান্তরেই হবে।' দিনের এই মহৎ প্রয়াসে তাঁকে সহায়তা করতে এগিয়ে আসেন শুধু রবীন্দ্রনাথ।

বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের মানস-সন্তান।

বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের একটি মহাকাব্য।

কবি তাঁর সুদীর্ঘজীবনের প্রতিদিনের চিন্তা, প্রতিদিনের কল্পনা আর উদ্যম দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন এই বিশ্বভারতী। তাঁর সৃজনশক্তির প্রতীক এই বিশ্বভারতী। একবার বিশ্বভারতীর এক সমাবর্তন উৎসবে তিনি বলেছিলেন: 'আমাদের এখানে নানা দেশ থেকে নানা জাতির অতিথি এসেছে— সমস্ত পৃথিবীর মানুষের একটি নীড় আমরা এখানে রচনা করেছি।' সত্যি, তিনি তাই করেছিলেন। সকল ধর্ম জাতি-র সাগর মিলনকেন্দ্র বিশ্বভারতী। মুসলমান ছাত্র-অধ্যাপক এলেন, খ্রীষ্টান-বৌদ্ধ-জৈন এলেন। এলেন বাংলার বাইরের ভারতীয়েরা – মারাঠি, গুজরাটি, হিন্দুস্থানি, অসমিয়া, তামিল, অন্ধ্র, মালয়ালি। সমুদ্রপারেও সাড়া পৌঁছে যায়। এলেন ইংরেজ, ফরাসি, জার্মান, ইতালীয়, চেক, হাঙ্গেরীয়, মার্কিন, মিশরীয়, চীনা, জাপানি, সিংহলী, আফ্রিকার নিগ্রো, মার্কিন নিগ্রো, ইরানের পারসিক, ইস্রায়েলের ইহুদী ইত্যাদি। এইভাবে সেদিন রবীন্দ্রনাথের আদর্শের আকর্ষণে ভুবনডাঙার মাঠে এসে সমবেত হয়েছিল পৃথিবীর সকল

দেশের মনীষা – ঠিক যেমনটি অতীতে হয়েছিল নালন্দায়। এই বিশ্বভারতীকে গড়ে তোলার জন্য কবি ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন; প্রদান করেছেন নোবেলের বহু অর্থ।

ছাতিমতলা একটি কুটিরকে রবীন্দ্রনাথ নিজের সাধনা ও কর্মের প্রভাবে পরিণত করলেন বিপুল বিশ্বভারতীতে। শুষ্ক নীরস মরুর বুকে গাছে ফুলে প্রকৃতির লীলা নিকেতন – শান্তিনিকেতন। পৃথিবীর দূর-দুরান্ত দেশ থেকে এখানে তিনি ডেকে এনেছেন কত জ্ঞানী-গুণী ও মনীষীদের। এখানেই প্রতিদিন পূর্ব গগনের প্রভাত-রবির কিরণ-ছটা এসে পড়তো আশ্রম-কবির তেজোদৃপ্ত মুখে। কর্মের সাথে আনন্দের, আনন্দের সাথে জ্ঞানের মিলন করেছেন তাঁর জীবনে। দেশের কল্যাণ সাধনই ছিল তার মূল উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন:

'দেশের জন্যে আমার মত কিছু ভাবেনি, সুদূর বাল্যকাল থেকে যা আমার মনকে অবিরত আচ্ছন্ন করে ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমেই কিছু তা প্রকাশ পায়নি। আমি বরাবরই এই বেদনাকে রূপ দিতে চেয়েছি কাজে। এর জন্য সর্বস্ব পণ করেছিলাম। আমার সম্বল খুব বেশি ছিল না; যতটুকু ছিল, তাতেই নিঃশেষ করে পরীক্ষার কাজ চালিয়েছি। ভিক্ষাপাত্র হাতে খালি পায়ে পাগলের মত ঘুরে বেড়িয়েছি পথে পথে। দেশের লোকের প্রাণে সাড়া জাগানোর মত দিনের পর দিন কত অজানা অখ্যাত জায়গায় সভা করে বক্তৃতা দিয়ে গিয়েছি। এক মুহূর্ত বিশ্রাম নেবার সময় ছিল না।'

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি যে পৃথিবীর সকলের সেরা কর্মীপুরুষ ছিলেন তাই

বিশ্বভারতীর সঙ্গে শ্রীনিকেতনের যোগাযোগ বলতে হয়। বিশ্বভারতীরই একটি অঙ্গ শ্রীনিকেতন। ১৩২৮-এর মাঘে এর প্রতিষ্ঠা। উদ্দেশ্য ছেলেদের হাতে-কলমে কাজ শেখানো। কেবল পুঁথিগত বিদ্যা মানুষকে করে অকর্মণ্য। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সবচেয়ে ত্রুটি হইল যে, পুঁথির বাইরে যেসব দরকারী জিনিস আছে, সেসবের দিকে আমাদের অভ্যাসের একেবারেই নেই। এই শ্রীনিকেতনে কবি শিক্ষার ক্ষেত্রে আর একটি নূতন পরীক্ষায় হাত দিয়েছিলেন। বিদ্যা অনুশীলনায় যাবতীয় সব শ্রীনিকেতনে ছেলেদের হাতে কলমে শেখানো হয়। পল্লী-বাংলার মর্মের সন্ধান পেয়েছিলেন কবি। শুধু কবিতা রচনা করেই তিনি ক্ষান্ত হননি। বাংলার প্রাণ তার গ্রাম। ভারতের হৃৎপিণ্ড তার গ্রাম। তাই কবি এবার নামলেন গ্রামসেবার কাজে, পল্লী-সংগঠনের কাজে। শিলাইদহে থাকতে প্রজাদের অবস্থা খুব কাছে দেখেছেন তিনি। বুঝেছিলেন বাংলাদেশকে বাঁচাতে হলে এর গ্রামগুলিকে বাঁচাতে হবে।

কেমন করে এ সমস্যা দূর করা যায়? তারই পরীক্ষা তিনি করেছেন শ্রীনিকেতনে। ১৩০৪ (১৯২৩) সাল থেকে তিনি বলে চলেছেন গ্রামে গ্রামে জাগিয়ে তুলতে হবে দেশের প্রাণশক্তি। ভারতবর্ষে পল্লী উন্নয়নের চিন্তা রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম করেছেন — এ কথাটা আমরা যেন বিস্মৃত না হই। গ্রাম উন্নয়নের কাজ করবে বলে অনেক আগে থেকেই তিনি কায়েমুরের নীলকরদের কাছ থেকে সুরুল কুঠি ও তেমন কাছাকাছি অনেকখানি জমি কিনে রেখেছিলেন। রথীন্দ্রনাথকে পাঠিয়েছিলেন আমেরিকায় সেখানকার এক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষিবিজ্ঞান শিখে আসবার জন্য। শান্তিনিকেতনের পাশেই সুরুল। এইখানে তিনি স্থাপন করেন পল্লীসংগঠন সংস্থা। এর নাম রাখলেন শ্রীনিকেতন। প্রাচীন

॥ পাঁচ ॥

রবীন্দ্রনাথের জীবন তাঁর আশী বছর পর্যন্ত প্রসারিত বহমান।

সেই জীবনে কত ঘটনা, কত কাহিনী আর সেই জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাংলা তথা আনুষঙ্গিক জীবন। তাঁর জীবন-বীণায় উঠেছে কত রকমের সুর — এইসব সুরের লহরীতে ভেসে গেছে বাঙালীর মন, বাঙালীর চিত্ত। ভারতবাসীরও। সেই সুরের মধ্যে একটি হলো স্বদেশপ্রেম। এইবার স্বদেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথের কথা কিছু বলব। যে পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি স্বদেশপ্রেমের একটি পীঠস্থান ছিল বললেই হয়।

লর্ড কার্জন তখন ভারতের বড়লাট। কলকাতা ভারতের রাজধানী; গরমের সময়টা লাট সাহেব থাকতেন সিমলা পাহাড়ে। উনিশ শতকের একেবারে শেষের দিকে (১৮৯৯) কার্জন এলেন রাজপ্রতিনিধি হয়ে; পুরো পাঁচটা বছর তিনি দাপটের সঙ্গে এদেশ শাসন করেছেন। বাঙালীর ঐক্য, বিশেষ করে শিক্ষিত বাঙালী (হিন্দুদের মধ্যে) জাতীয়তাবোধ তখন প্রবলভাবে জেগে উঠেছে। কার্জন ভয়ে অস্থির হলেন। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি বাংলাকে ভেঙে দু'টুকরো করতে চাইলেন — একটা হিন্দুদের থেকে, মুসলমানদের একেবারে আলাদা করে রাখবেন। নিজেই করলেন তোড়জোড় ব্যবস্থা। দ্বিতীয় মনে দ্বিধা [illegible]। বিলেতের পার্লামেন্টে এই কার্জনী বিধান অনুমোদন করে শেষে আইন পাশ করলো। এই ঘটনা ১৯০৫ সালের।

১৯০৫-এর বাংলা। এই বাংলা দু'টুকরো হলো সরকারী আদেশে। বাঙালীর মাথায় যেন বজ্রপাত হলো। খবর শুনে উঠে প্রতিবাদ। প্রতিবাদ [illegible]

(স্বদেশী আন্দোলন)

শুরু হয় স্বদেশী আন্দোলন। রবীন্দ্রনাথ এই আন্দোলনের সামিল হয়েছিলেন, কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হয় বাংলাদেশের এক নূতন আত্মচেতনা। হিন্দু-মুসলমানের একাত্মতার জন্য এক রাখীবন্ধন উৎসব, এক নূতন মন্ত্র দিয়ে তিনি লিখলেন:

বাংলার মাটি, বাংলার জল
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান।

বাংলার এই জাতীয় স্বদেশী আন্দোলনের যুগে দিয়েছিলেন বাংলার হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল নর-নারীকে ঐক্যের মন্ত্র, মিলনের মন্ত্র। [illegible] সেদিন [illegible] ভূমিকায় [illegible] দেশের লোকের মনে যে উদ্দীপনার, যে দেশপ্রেমের সঞ্চার করে দিয়েছিলেন তা কোনোদিনই ভুলবার নয়। বাংলার অগ্নিযুগের সেদিন, পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনের কাজে বিপ্লবীদের [illegible] যে অন্ধকারময় পথে অগ্রসর হয়েছিলেন তাদের [illegible] মশাল জ্বালা করেছিলেন তিনি। ভীরু স্বদেশবাসীকে আহ্বান করে তিনিই সেদিন বলেছিলেন:

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই, ওরে ভয় নাই।
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।

স্বদেশী যুগের বাংলায় একটি স্মরণীয় ঘটনা 'শিবাজী উৎসব'। এ হলো ১৯০৪ সালের কথা। পুণা থেকে বালগঙ্গাধর তিলক এলেন। এই [illegible] উপলক্ষে

আত্মদান করতো। জাতীয় জীবনে শেষ যেন এক নূতন শক্তি সংবদ্ধ হয়ে উঠতে চেয়েছিল, স্বাধীনতালাভের প্রত্যক্ষ তাগিদ বলে প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। সেই দিনকেই বাইরে রূপ নিয়েছিল এই উৎসবের মধ্যে আর তাকেই ভাষা দিলেন কবীন্দ্রনাথ প্রসিদ্ধ বিখ্যাত কবিতায়। সেই কবিতার নাম: 'শিবাজী' মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাতের সূর্য শিবাজীকে এক নূতন রূপে তাঁর দেশবাসীর সামনে তুলে ধরলেন উদ্দীপনাময়ী এই কবিতা। টাউন হলের বিরাট সভায় দীর্ঘ সমুন্নত দেহ শান্ত-কান্তি কবি যখন দাঁড়িয়ে উঠে তাঁর উদাত্ত কন্ঠে পাঠ করলেন:

কোন্ দূর শতাব্দের কোন্ এক অখ্যাত দিবসে
নাহি জানি আজি।
মারাঠার কোন্ শৈলে অরণ্যের অন্ধকারে বসে
হে রাজা শিবাজী—

তখন সভায় উপস্থিত শ্রোতাদের মনে যে শিহরণ খেলে গিয়েছিল তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। এই অলৌকিকত্বের উদ্দীপনাতেই কবি লিখেছিলেন 'কথা ও কাহিনী'। বাঙালীর চোখের সামনে ভেসে উঠলো প্রাচীন ভারত — মুক্তিকামী বাঙালী জনতার চিত্তে জেগে উঠলো মারাঠী, রাজপুত ও শিখের জ্যোতির্ময় স্মৃতি। জনতার কন্ঠে সহজেই ধ্বনিত হয়

এসেছে সে একদিন
লক্ষ পরানে শঙ্কা না জানে
না রাখে কাহারো ঋণ।
জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন।

তেমনি গোরাকে দেখা গিয়েছিল স্বাধীনতার দিনে সকলের সঙ্গে সমস্বরে মিলিত হয়ে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে স্নান করে চলেন সকলে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য, অপূর্ব অনুভূতি। একে অন্যের হাতে রাখী বেঁধে দেয় আর কবির রচিত গান গেয়ে বলে:

বাঙালির প্রাণ বাঙালির মন
বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান।

সোনার বাংলার সেই রক্ত রাঙা দিনে কবির চিত্ত উদ্বেলিত প্রাণের ঝড়। কবি যেন প্রত্যক্ষ করলেন সেই ঝড়ের কেন্দ্র থেকে বাংলার এক নূতন আবির্ভাব। কবি শুধু দেশজননীর কোন বিশেষ অন্তর্যামী রূপই দেখলেন না, নদী-মাঠ-আমবন-ঘেরা পল্লীবাংলাকেও প্রত্যক্ষ করলেন। তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত দীপক ঝংকার:

আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।

এই স্বদেশীযুগেই তিনি লিখেছিলেন গোরা উপন্যাস।

রবীন্দ্র প্রতিভার এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। এর বিস্তীর্ণ পটে রবীন্দ্রনাথ উপস্থাপিত করলেন ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের, সমাজের সঙ্গে ধর্মের আর ধর্মের সঙ্গে সত্যের বিরোধ ও সমন্বয়ের ক্রিয়াকলাপ। যে সামাজিক বৈষম্য, আচার বিচারের নিগড়, জাতিভেদের বেড়া আর জমিদারদের অপরিসীম দারিদ্র্য ও শোষণ দেশকে ছিন্ন ভিন্ন

নিয়ে চলেছে বিনাশের পথে, 'গোরা' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ একেই তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে। 'গোরা' আধুনিক ভারতের মহাকাব্য—শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য। কিভাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা কামনা করতে হবে এবং সেই স্বাধীনতা কামনা করতে হবে তাকে ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন উপন্যাসের নায়ক 'গোরা' চরিত্রের ভেতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তা যেভাবে ব্যক্ত করেছেন তা প্রশংসার্হ, অতুলনীয়, অবিস্মরণীয়।

স্বদেশ প্রেমিক রবীন্দ্রনাথের আরেক মূর্তি আমরা দেখছি।

১৯১৯, ১৩ এপ্রিল। বৈশাখের প্রথম দিন।

পাঞ্জাবের অমৃতসর শহরে জালিয়ানওয়ালাবাগে বিশ হাজার লোকের একটি সভা ডাকা হয়েছে। সমস্ত পাঞ্জাবে তখন চলেছে সরকারী শাসন—[সমস্ত সামরিক] সভাসমিতি নিষিদ্ধ। মাইকেল ও'ডায়ার তখন পাঞ্জাবের লাটসাহেব। জেনারেল ডায়ার সামরিক শাসনকর্তা। যেখানে সভা হচ্ছে তার তিন দিকেই উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। জেনারেল ডায়ার কোনরকম সতর্ক করে না দিয়েই গুলী চালালো সেই নিরস্ত্র ও নিরীহ জনতার ওপর। হাজার হাজার লোক হত আহত; তাদের রক্তে লাল হয় পাঞ্জাবের মাটি। সাথে সাথে জারী হয় সামরিক আইন। খবরের কাগজে পাঞ্জাবের সংবাদ প্রকাশ নিষিদ্ধ হলো। লোকজনের ওপর চলতে থাকে অকথ্য অত্যাচার। এক নিদারুণ ঘটনা ঘটে গেল পরাধীন ভারতবর্ষে। তারপর কেটে যায় কাল যেদিন লৌহযবনিকা ভেদ করে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের খবর মাত্র হলো সারা দেশে, জ্বলে উঠতে দেখা দিলো প্রচণ্ড বিক্ষোভ। কিন্তু প্রতিবাদ করার পথ বন্ধ।

রবীন্দ্রনাথ এই সংবাদ শুনে শুধু মর্মাহতই হলেন না, রীতিমত অস্থির হয়ে উঠলেন। কল্পনার চক্ষে তিনি যেন দেখতে পেলেন মর্মান্তিক এক একটি দৃশ্য। বন্দুকধারী সেনা বেপরোয়া গুলি চালাচ্ছে নিরস্ত্র এবং নিরপরাধ জনতার ওপর। দেওয়ালের [illegible] শবদেহ পড়ে আছে [illegible]। পৈশাচিক উল্লাস ওদের নগ্ন মূর্তি নিয়ে নৃত্য করে বেড়ায় পথচারীদের নানা স্থানে। রক্তে রাঙা হয়ে ওঠে এক রাজপথ। এক রাজপথে [illegible] ওঠে মিলিটারী মেজর হাতে চাবুক। সপাং সপাং বাঁধা লোকেদের পিঠের ওপর — শরীরের চামড়া প্রায় কেটে যায় সেই তীক্ষ্ণ আঘাতে। এক নারীর সর্বস্ব হয় লুণ্ঠিত। এমন পথচারীকে আদেশ করতে হয় রাজপথে বুকে হেঁটে আর এক পথের পাশেই ওঠে ফাঁসীর মঞ্চ।

কল্পনা নয় — এমনই বাস্তবে ঘটেছিল, পরে জানা গেল। এন্ড্রুজ সাহেবকে পাঠালেন পাঞ্জাবের খবর আনতে। [illegible] পাঞ্জাবের হাহাকার [illegible]। মর্মাহত কবি তাঁর কর্তব্য স্থির করলেন। তিনিই এর প্রতিবাদ করবেন। চলে এলেন কলকাতায়। দেখা করলেন এক বিশ্রুত দেশনেতার সঙ্গে। বললেন, যদি প্রতিবাদ সভা ডাকেন, আমি তাতে বক্তৃতা করব। তিনি রাজী হলেন না। ভারতশাসন আইনের নাগপাশে, সংস্কারের সবাই বদ্ধ। সারা দেশ যেন ভয়ে মূহ্যমান। তারপর?

রবীন্দ্রনাথ যেদিন স্যর রবীন্দ্রনাথ। ইংরেজশাসকদের হাতে লাভ করেছিলেন, তিনি সর্বোচ্চ খেতাব — নাইটহুড উপাধি। চেমসফোর্ড তখন বড়লাট। ৩০শে মে-র প্রভাতী সংবাদপত্রে ছাপল 'মরিয়া' [illegible] পাঞ্জাবের অত্যাচারের প্রতিবাদে অর্পিত 'স্যর' উপাধি বর্জন করে বড়লাটকে [illegible] খোলা চিঠি লিখেছেন। চিঠি তো নয়—

যেন আগ্নেয়গিরিস্রাব। দেশের সেই দুর্দিনে সত্যের গৌরবদৃপ্ত প্রদীপ্ত তেজে' সারা দেশকে জাগিয়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথ। পাঞ্জাবের শোচনীয় হত্যাকাণ্ডে বিচলিত ও ব্যথিত কবি যে কতখানি হয়েছিলেন তা বোঝা গেল সেই চিঠিতে। তাঁর জীবনের পরম গৌরবের নিদর্শন হয়ে আছে তাঁর এই চিঠিখানি যার প্রতিটি কথার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে পরাধীনতার বেদনা আর অপমান। সেই বেদনা ও অপমান তিনি যে কতখানি অনুভব করেছিলেন তা বোঝা গেল যখন রবীন্দ্রনাথ উপাধি ত্যাগ করার পর ইংলণ্ডে গিয়ে সেখানে 'ইংরেজ শাসকের অনাচার অত্যাচারের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় দলিল। চিঠি নয় – যেন জ্যোতির্ময় আলোকরশ্মির তরবারি-লেখা। বাংলার কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হলো রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ধিক্কার। ইংরেজের হাতে-পাওয়া মানের মুকুট ছুঁড়ে ফেলে দিলেন তিনি ধুলোয় – এসে দাঁড়ালেন তাঁর লাঞ্ছিত স্বদেশবাসীর পাশে। লিখলেন বড়লাট চেমসফোর্ডকে:

'যখন দেখিলাম, আমাদের সকল দরবার ব্যর্থ হইল; যখন দেখা গেল, প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তিতে আমাদের গবর্মেন্টের রাজদৃষ্টি অন্ধ করিয়াছে; অথচ যখন নিশ্চয় জানি, নিজের প্রভূত বাহুবল ও চিরাগত ধর্মনিয়মের অনুযায়ী মহদাশয়তা অবলম্বন করা এই গবর্মেন্টের পক্ষে কত সহজ ছিল, তখন স্বদেশের কল্যাণকামনায় আমি এইটুকুমাত্র করিবার সংকল্প করিয়াছি যে, আমাদের বহু কোটি যে ভারতীয় প্রজা আজ আকস্মিক আতঙ্কে নির্বাক হইয়াছে, তাহাদের আপত্তিকে ধ্বনিত করিবার সমস্ত দায়িত্ব এই পত্রযোগে আমি

নিজে গ্রহণ করিব।... আমার যে সকল স্বদেশবাসী তাহাদের তথাকথিত অকিঞ্চিৎকরতার লাঞ্ছনায় মনুষ্যের অযোগ্য অসম্মান সহ্য করিবার অধিকারী বলিয়া গণ্য হয়, নিজের সমস্ত সম্মানচিহ্ন বর্জন করিয়া আমি তাহাদেরই পার্শ্বে দাঁড়াইতে ইচ্ছা করি।... অতএব এই উপলক্ষে উপস্থাপিত করিতে বাধ্য হইয়াছি যে, সেই নাইট-পদবী হইতে আমাকে নিষ্কৃতিদান করিবার ব্যবস্থা করা হয়।'

পাঞ্জাবের দুঃখের আঘাতে কবির বুকের পাঁজর কতখানি দুমড়ে গিয়েছিল সে কথা যখন আমরা মনে করি, তখন এই কথাটা আমরা না ভেবে পারি না যে — সেদিন, সেই আতঙ্কিত দুর্দিনে, অন্ধকার ও অবসাদের আকাশে যে রক্ত বৃষ্টির ঘনমেঘ নেমে এসেছিল, তারই বুক চিরে বজ্রের আলো যেভাবে দেখা দিয়েছিল, তারই মধ্যে আমরা যেন প্রত্যক্ষ করি 'স্বদেশ আত্মার বাণীমূর্তি' রবীন্দ্রনাথকে। দেশের লোক সেদিন তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিল।

আবার আমরা কবির সেই দৃপ্ত মূর্তি দেখলাম উনিশ বছর পরে। হিজলী হত্যাকাণ্ডের দুঃখ, অপমান ও বেদনা থেকে আবার নির্গত হয় জ্বালাময়ী অগ্নিস্রাব। কবির কণ্ঠে ইংরেজের দণ্ডধরদের দণ্ডনীতির বিরুদ্ধে আবার জেগে ওঠে প্রতিবাদ: 'ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে / দয়াহীন সংসারে।' বাংলার জেলে জেলে তখন চলেছে রাজবন্দীদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার, অবর্ণনীয় নির্যাতন। সেই অত্যাচার চরমে উঠল মেদিনীপুরের হিজলী বন্দীনিবাসে। এখানে বিনা বিচারে আটক রাজনৈতিক বন্দীরা থাকতেন। ১৯৩১, ১৬ সেপ্টেম্বরের রাতে বর্বর রক্ষীরা অসহায় রাজবন্দীদের ওপর গুলি চালায় বিনা কারণে। নিহত হলেন রাজবন্দী তারকেশ্বর সেনগুপ্ত আর সন্তোষ মিত্র। আহতদের সংখ্যাও কুড়ির নীচে নয়। দুটি শব বন্দীশালার বাইরে

সে খবর কেউ জানতে পারেনি। তারপর কোনো এক পথ দিয়ে খবরটা হলো অনেকেরই, আর মর্মে মর্মে তা ছড়িয়ে পড়ল বিদ্যুৎগতিতে সারা বাংলায়। দেশবাসী জানল কী নৃশংস অত্যাচার হয়ে গেছে হিজলীর নির্জন প্রান্তরে অবস্থিত ওই বন্দীশালায়। দেশময় দেখা দিল প্রবল বিক্ষোভ। সুভাষচন্দ্র ও দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন, বাংলার এই দুই নেতা ছুটে গেলেন হিজলীতে। তাঁরা নিয়ে এলেন এই দুই বীর শহীদের মরদেহ।

হিজলীহত্যার প্রতিবাদে কলকাতায় জনসভা হলো গড়ের মাঠে, মনুমেন্টের তলায়। অসুস্থ শরীর নিয়েই সভায় এলেন বাংলার প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অত্যাচারিতদের কথা বলার জন্য। অত্যাচারিত মনুষ্যত্বের দিকে তাকিয়ে কবি সেদিন বলেছিলেন: 'আমি আমার স্বদেশবাসীদের হয়ে রাজপুরুষদের এই বলে সতর্ক করতে চাই যে বিদেশীরাজ যত পরাক্রমশালী হোক না কেন, আত্মসম্মান হারানো তার পক্ষে সবচেয়ে দুর্বলতার কারণ। এই আত্মসম্মানের প্রতিষ্ঠা ন্যায়পরতায় - ক্ষোভের কারণ সত্ত্বেও অবিচলিত সত্যনিষ্ঠায়। প্রজাকে পীড়ন স্বীকার করে নিতে বাধ্য করা রাজার পক্ষে কঠিন না হতে পারে, কিন্তু বিধিদত্ত অধিকার নিয়ে প্রজার মন যখন স্বয়ং রাজাকে বিচার করে তখন তাকে নিরস্ত করতে পারে কোন শক্তি?'

সেইদিন মর্মাহত কবি অশ্রুসজলে ভগবানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন:

যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?

দেশপ্রেমিক ছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমস্ত অন্তর দিয়ে শ্রদ্ধা করতেন, ভালোবাসতেন তাঁদের যাঁরাই দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। সেই

স্বদেশী আন্দোলনের সময় শ্রীঅরবিন্দকে রাজশক্তি যখন প্রথমবার গ্রেপ্তার করে তখন কবি তাঁকে নমস্কার জানিয়ে একটি অনুপম কবিতা লিখেছিলেন। সেই কবিতায় তিনি তাঁর মনের জোর এই ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন:

দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে
সেই রুদ্রদূতে, বলো, কোন্ রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে। বন্ধনশৃঙ্খল তার
চরণবন্দনা করি করে নমস্কার—
কারাগার করে অভ্যর্থনা।

তেমনি প্রকালের জেল মুক্তিসংগ্রামীদেরও তিনি বিস্মৃত হননি। এর একটা ঘটনার উল্লেখ করছি। দুর্গম ভুটান-সীমান্তে বক্সা দুর্গ তখন বন্দীশিবিরে পরিণত হয়েছে। বাংলার বহু বিপ্লবী সেখানে আটক ছিলেন। একবার তাঁরা রবীন্দ্রজয়ন্তী উদ্‌যাপন করলেন। বন্দীশিবির থেকেই পাঠালেন তাঁরা কবিকে তাঁদের প্রাণের প্রণাম। সে-অভিনন্দন দেশপ্রেমিক কবির হৃদয় স্পর্শ করলো। উত্তরে তিনি বন্দীদের লিখে পাঠালেন:

নিশীথেরে লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্দন।
চিত্তের আনন্দেরে দুঃখেতে চিনিল কে রে,
বন্দীর শৃঙ্খলছন্দে মুক্তির কে দিল পরিচয়।

রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেমের নিদর্শন আরো আছে। ১৯৩২, জানুয়ারি। মহাত্মা গান্ধী বিলেত থেকে ফিরছেন। গোল টেবিল কনফারেন্সে তিনি গিয়েছিলেন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে আলোচনা করতে; কিন্তু তাঁকে ফিরতে হলো নিরাশ হয়ে খালি হাতে। দেশে ফিরবার সাতদিনের মধ্যেই বড়লাট তাঁকে বন্দী করার আদেশ জারি করলেন।

স্মরণ যারা বন্দী ছিলেন বিনা বিচারে আটক রাখা হলো তাঁকে। সেদিনও দেশজোড়া
বিলেতে প্রবাস ঘটিয়ে তারবার্তা পাঠিয়ে দিলেন।
কবি নীরব রইলেন না, প্রবাসী পত্রিকাতে জানালেন প্রতিবাদ। তাতে বললেন, 'এর পর ইংরেজ রাজপুরুষেরা আর কী করে ভারতীয়দের কাছ থেকে সহযোগিতা ও শান্তিপূর্ণ সম্প্রীতির সম্ভাবনা আশা করতে পারেন?' এই বছরেই জেলে গান্ধীজির সেই ঐতিহাসিক অনশন আরম্ভ হয়। এর উপলক্ষ ছিল হরিজন সমস্যা। এই অনশন ছিল আমৃত্যু অনশন। এই সংবাদে যারপরনাই বিচলিত হলেন রবীন্দ্রনাথ। কবি গান্ধীজির কাছে ছুটলেন। অবশেষে তিনি প্রাণ রক্ষা করলেন। সাম্প্রদায়িক ক্ষেত্রে সংকট হলো। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী গান্ধীজির দাবী মেনে নিয়েছেন। কবির সামনেই গান্ধীজি ভঙ্গ করেন তাঁর অনশন ব্রত। সেদিন মহাত্মাজীর অনুরোধে তাঁর সামনে কবি গেয়েছিলেন:

জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো।
সকল মাধুরী লুকায়ে যায়, গীতসুধারসে এসো॥
কর্ম যখন প্রবল-আকার, গরজি উঠিয়া ঢাকে চারিধার
হৃদয়প্রান্তে হে জীবননাথ, শান্ত চরণে এসো॥

১৯৩৭

১৯৩৭। আন্দামানে বাংলার রাজবন্দীদের উপর অকথ্য অত্যাচার চলছে। সংবাদ শুনে রবীন্দ্রনাথ উদ্বিগ্ন হন। তখন তাঁর বয়স ছিয়াত্তর। টাউন হলে এক জনসভার আয়োজন হলো। তাতে সভাপতি তিনি — স্বাধীন ভারতবাসীর মাথার উপর অত্যাচার নিয়ে সূচনায় বলে জানালেন — তিনি ছাড়া আর কে মর্মবেদনাকে ভাষা দেবেন যে, কেউ না করলেন প্রতিবাদ? বৃদ্ধ কবিকে সেই দুর্দশায় সভাপতিত্ব করতে হলো। দ্বীপান্তরিত রাজবন্দীরা তখন অনশন শুরু করে দিয়েছেন। কবি জানালেন সহানুভূতি, সরকারের হৃদয়হীন মনোবৃত্তি

ও আদর্শের করলেন তীব্র প্রতিবাদ। তারপর প্রথম তিনি আন্দামানের রাজবন্দীদের সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলেন: 'দেশ তোমাদের দিকে চেয়ে আছে।' অগ্নিবীণার বিদ্রোহী কবি নজরুল যখন কর্তৃপক্ষের আচরণের প্রতিবাদে অনশন শুরু করেন, তখন আমরা দেখেছি রবীন্দ্রনাথকে বিচলিত হতে। অনশন ভাঙার জন্য অনুরোধ জানিয়ে টেলিগ্রাম পাঠালেন: 'দেশ তোমাকে চায়, অনশন ত্যাগ করো।'

দেশের জন্য সুভাষচন্দ্রের অতুলনীয় ত্যাগ ও নির্যাতন স্বীকারকে অভিনন্দিত করে কবিই সর্বপ্রথম তাঁকে দেশনায়কের পদে বরণ করেছিলেন এই বলে: 'সুভাষ, আজ তুমি যে আলোকে প্রকাশিত, তাতে সংশয়ের কালিমা আর নেই, মধ্যাহ্নে তোমার পরিচয় সুস্পষ্ট।... তোমাকে দেশনায়ক তুমি একান্ত সত্য বলে মেনেছি। আমি আজ তোমাকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রনেতার পদে বরণ করি।' জেলে, দ্বীপান্তরে, ফাঁসির মঞ্চে বাংলার যে নির্ভীক তরুণের দল তাদের জীবনকে স্বাধীনতার বেদীমূলে দেশজননীর [redacted] হাসতে উৎসর্গ করে, স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছেন কবি বারবার তাঁদের জানিয়েছেন তাঁর আশীর্বাদ, আর তাঁদের যাত্রাপথকে তিনিই তো আলোয় ভরে দিয়েছিলেন তাঁর গানে, তাঁর কবিতায়।

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তর দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা কামনা করেছেন। প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংগ্রামে তিনি কখনো নামেননি, কিন্তু সেই সংগ্রামকে তিনি কোথায় থেকে কতখানি প্রেরণা জুগিয়েছেন তার কোনো তুলনা নেই। ১৯৪১ সাল। কবির জীবনের শেষ বছর। তখন ইউরোপে আরম্ভ হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। এই সময়ে দেশের সকল নেতাই জেলে। তাঁরা চেয়েছিলেন ভারতকে স্বাধীনতা-দানের প্রতিশ্রুতি/সুস্পষ্ট, এই বিষয়ে দাবি ভারতীয়দের পক্ষে অকাট্যতা, এইসব কথা বলে, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের

ইংলন্ডের মহিলা সদস্য মিস রাথবোন ভারতীয় নেতাদের ও বিশেষভাবে জওহরলালের নিন্দা করে এক প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর এই আক্রমণের প্রতিবাদ করলেন কবি। তাঁর জীবন সন্ধ্যায় তাঁকে শেষবারের মতো ভারতের প্রতি এক বিদেশীর অপমানের উক্তির প্রতিবাদ করতে দেখি। রোগজীর্ণ দেহে মিস রাথবোনের চিঠির উত্তরে কবি লিখলেন: 'মিস রাথবোনের চিঠি পড়িয়া আমি গভীর বেদনা অনুভব করিয়াছি। তাঁহার এই পত্র প্রধানত জওহরলালের উদ্দেশেই লিখিত এবং আমি একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, মিস রাথবোনের দেশবাসিগণ আজ যদি ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের এই মহানুভব যোদ্ধার কণ্ঠ কারাপ্রাচীরের অন্তরালে রুদ্ধ না করিত, তাহা হইলে তিনি যথাযোগ্য ও সত্যের উত্তর দিতেন। বলপ্রয়োগকারীদের তাঁহার মৌনতা আরোপের জন্যই, রোগশয্যা হইতে এই প্রতিবাদ আমাকেই করিতে হইল।'

(লর্ড-উপাধি বর্জন করে,

(ভারতের স্বাধীনতার দলিল) রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ এই 'খোলা চিঠিখানি', লর্ড চেমসফোর্ডকে লেখা সেই দৃপ্ত চিঠির মতোই আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি অমূল্য দলিল হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। এমনি করেই তিনি স্বদেশীযুগের উষাকাল থেকে আরম্ভ করে বিংশ শতকের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ দিন পর্যন্ত, জাতির মর্মভেদী বেদনাকে, তার পরাধীনতার জ্বালাকে ভাষা দিয়েছেন — আশার বাণী শুনিয়েছেন বার বার। এমনি করেই স্বদেশলক্ষ্মীর বেদীমূলে কবির আলো দান করে গিয়েছে তার উজ্জ্বল দীপ্তি। কালের পটে সে-দীপ্তি অম্লান। জাতির চিত্তলোকে স্বদেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথের আসন চির অক্ষয়।

—

॥ ছয় ॥

দিলো ডাক, পঁচিশে বৈশাখ।

কবির জীবনে একে একে ঊনপঞ্চাশটি বৈশাখ অতিক্রান্ত হলো, এবার তাঁর জীবনে এলো পঞ্চাশতম বৈশাখ — এলো তাঁর এই বরণীয় জন্মতিথি, জ্যোতির্ময় জন্মদিন। প্রতি বৎসর এই তিথিতে তিনি যেন পঁচিশে বৈশাখের আহ্বান শুনতে পেতেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হয় ১৯১১-তে। এই উপলক্ষ্যে শান্তিনিকেতনে তাঁর স্কুলের ছাত্র আর শিক্ষকেরা মিলে কবিকে দিলেন শ্রদ্ধা ও প্রীতির অর্ঘ্য। তাঁর স্বদেশবাসীরাও পিছিয়ে রইলেন না। কলকাতার টাউন হলে উদ্‌যাপিত হলো বিশ্ববরেণ্য কবির পঞ্চাশৎ জন্মবার্ষিকী। স্বদেশে তাঁর স্বদেশবাসীর পক্ষে এই তাঁর প্রথম সংবর্ধনা — প্রথম বরণ।

জীবনের পঞ্চাশটি বছর পূর্ণ করেছেন এবং এর মধ্যে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে কাব্য, কবিতা, গান, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতির ভেতর দিয়ে তিনি শুধু বাংলা সাহিত্যকেই সমৃদ্ধ করেননি — বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে স্থাপন করেছেন। আধুনিক কালে ভারতবর্ষে কবির এমন জাতীয় সংবর্ধনা এই প্রথম। এমন আয়োজন আগে কেউ দেখেনি। দেশবাসীর পক্ষ থেকে রবীন্দ্র-প্রতিভার এই প্রথম স্বীকৃতি। বাংলার বিশ শতকের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এটি স্মরণীয় হয়ে থাকার মতো ঘটনা। এর আগে আর কোনো সাহিত্যিক দেশবাসীর কাছ থেকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান পাননি।

২৮ শে জানুয়ারি, ১৯১২। কলকাতা টাউন হলের জলসাতে তিল ধারণের স্থান ছিল না। সভাটি লোকে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। সেই স্মরণীয় সভায় বাংলার যত মনীষি সবাই উপস্থিত হয়েছিলেন। দেশের মধ্যে তখন যাঁরা শ্রেষ্ঠ বিদ্যায়

১৯১৩, ১৫ নভেম্বর। সন্ধ্যাবেলা। খবর শান্তিনিকেতনে এলো। খবর হলো রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের জন্য দুর্লভ 'নোবেল প্রাইজ' পেয়েছেন। নোবেল প্রাইজ কি জানো? [redacted] সুইডেনের বিখ্যাত বিজ্ঞানী (ইনি ডিনামাইট আবিষ্কার করেছিলেন) আলফ্রেড নোবেল প্রায় কোটি টাকা সুইডিস অ্যাকাডেমির হাতে দিয়ে গেছিলেন, ঐ টাকার সুদ থেকে সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতি পাঁচটি বিষয়ে পাঁচটি পুরস্কার যেন যোগ্য ব্যক্তিদের বছরে বছরে দেওয়া হয়। ১৯০১ সাল থেকে পাঁচটি বিষয়ে কাজের শ্রেষ্ঠ পাঁচজন ব্যক্তিকে ঐ পুরস্কার দেওয়া হয়ে আসছে। এই পুরস্কারের অর্থমূল্য ছিল প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা। পৃথিবীতে এইটিই শ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার।

১৯১২ সাল পর্যন্ত এশিয়ার কোনো লোক কোনো বিষয়ে নোবেল প্রাইজ লাভ করেনি। রবীন্দ্রনাথই প্রথম যিনি এই দুর্লভ পুরস্কার পেলেন। তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পারো, আমাদের কবি কেমন করে এটা পেলেন; তিনি তো বাংলায় লেখেন। তাঁর এই প্রাইজ পাওয়ার ইতিহাসটা সংক্ষেপে বলি, শোনো। এই পুরস্কার লাভের পর থেকে তাঁর খ্যাতি শুধু বাংলাদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইলনা — দিগ্‌দিগন্তে তা ব্যাপ্ত হলো, বিকীর্ণ হয় রবির আলো বিশ্ব চরাচরে। এশিয়ের বিজয় প্রচার হলো ওপারে—য়ুরোপে।

১৯১২, মে মাস। রবীন্দ্রনাথ বিলাত যাত্রা করলেন। এই তাঁর তৃতীয়বার বিলাত ভ্রমণ। এবারের 'মিশন' য়ুরোপের চিত্তলোক জয় করা। লণ্ডনে তখন ছিলেন তাঁর বন্ধু ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও নববিধান সমাজের প্রমথলাল সেন। এবার কবির বিলাত যাত্রার সঙ্গী ছিলেন পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও পুত্রবধূ

প্রতিভা দেবী। কবির আগমনের আগ্রহ প্রতীক্ষায় আছেন রোদেনস্টাইন। বছর দুই আগে ইনি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে গিয়েছিলেন। তখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হয় — তারপর চিঠিপত্রের ভেতর দিয়ে কিছুটা পরিচয় দাঁড়িয়ে যায়। রোদেনস্টাইনই কবিকে লণ্ডনে আসবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু কবিতার ইংরেজী অনুবাদ পাঠ করে, কবিতাগুলির সৌন্দর্য্য দেখে মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছিলেন।

এবার কবির সঙ্গী ছিল তাঁর কয়েকটি বাংলা কবিতার ইংরেজী অনুবাদ। অনুবাদ তিনি নিজেই করেছিলেন। লণ্ডনে পৌঁছেই সেই অনুবাদ তিনি প্রথম দেখালেন রোদেনস্টাইনকে। সেগুলি পড়ে অপার আনন্দ পেলেন তিনি। কবিতা নয়, যেন খাঁটি মুক্তা, ভাবলেন তিনি। সেই সম্পদের সন্ধান দিলেন তিনি তখনকার সুবিখ্যাত (শ্রেষ্ঠ কবি) ডবলিউ. বি. ইয়েটসকে। ইয়েটস মুগ্ধ হলেন সেই তর্জমা-করা কবিতাগুলি পাঠ করে। তিনি ছুটে গেলেন লণ্ডনে তাঁর নিভৃত পল্লীনিবাস থেকে, ভারতের এই কবি-সার্বভৌমকে দেখবার জন্য।

ইয়েটস্ ও রবীন্দ্রনাথ।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এই দুই কবির মিলন সেদিনকার লণ্ডনের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে সূচনা করলো এক নূতন অধ্যায়ের। ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে মিলনের বীজ সেইদিনই রোপিত হয়েছিল সেইক্ষণে। সেদিন থেকেই রবীন্দ্রনাথের প্রতি কবি ইয়েটস্ হয়ে উঠলেন প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবান। তারপর অল্প কয়দিনের মধ্যে ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও মনীষীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হলো। তাঁরা সকলেই প্রাচ্যের এই নবোদিত সূর্যের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হলেন, তাঁর কবিতার মধ্যে তাঁরা পেলেন

নূতন সুর, নূতন ছন্দ। শেক্সপিয়র, মিল্টন ও শেলির দেশের লোকেদের কাছে সে-কবিতা ছিল সম্পূর্ণ নূতন। একদিন এক সংবর্ধনা সভায় ইয়েট্‌স্‌ ঘোষণা করলেন: 'আমার কবি-জীবনে আর একটি মহৎ ঘটনা উপস্থিত হয়েছে যে, এখন আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংবর্ধন ও সম্মান করবার ভার পেয়েছি। তাঁর রচিত প্রায় একশোটি গীতি কবিতার অনুবাদের একটি পাণ্ডুলিপি আমার সঙ্গে নিয়ে ফিরছি। আমার সমসাময়িক আর কোনো কবির এমন লেখা ইংরেজি ভাষার ভিতর আমি জানিনে যার সঙ্গে এই কবিতাগুলির তুলনা হতে পারে।' ইয়েট্‌স্‌ স্বয়ং ছিলেন সেই সভার সভাপতি।

বিলাতের ইন্ডিয়া সোসাইটি থেকে বেরুলো 'গীতাঞ্জলি'।

'SONG OFFERINGS' এই নামে প্রকাশিত অনুবাদের ভূমিকা লিখলেন ইয়েট্‌স্‌। তীর্থযাত্রীর অন্তরকে নিয়ে কবি যখন এসেছিলেন য়ুরোপে, সেইসঙ্গে এদেশের কথা নিয়ে গিয়েছিলেন অঞ্জলি ভরে তাঁর প্রাণের গভীর আধ্যাত্মিক আকুতি। য়ুরোপের মানুষের জীবনে তখন দেখা দিয়েছে ঘোর সমস্যা। তাই তাদের কাছে 'গীতাঞ্জলি' মনে হয়েছিল যেন একটি স্নিগ্ধ আলোর উদ্ভাসন। ইংলণ্ডের বিদগ্ধ মহলে সহজেই সমাদর লাভ করলো রবীন্দ্রনাথের সেই কাব্যগ্রন্থ।

কাগজে কাগজে গীতাঞ্জলির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা।

'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' - এই সুন্দর নামটি সকলের মুখে মুখে।

সত্যিই সেদিন এই নামের তরঙ্গ উঠেছিল ইংলণ্ডের ঘরে ঘরে।

গীতাঞ্জলির গান জাগিয়ে তুললো সেখানকার সাহিত্যিক, কবি ও শিল্পীদের।

বিপুল সম্মান লাভ করলেন রবীন্দ্রনাথ। আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে সেদিক থেকে, ভারতীয় কবির সম্মানলাভ এই প্রথম। তোমরা অনেকেই হয়তো ইংরেজি গীতাঞ্জলি পড়ে থাকবে। জিজ্ঞাসা করতে পারো কী পেয়েছিল য়ুরোপ সেদিন এই ছোট্ট বইটির মধ্যে? পেয়েছিল বিশ্বব্যাপী মহামিলনের মন্ত্র:

বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।

এইখানে স্মরণ করে রাখি গীতাঞ্জলির একটু ইতিকথা। নৈবেদ্য, শিশু, উৎসর্গ ও খেয়া-র পর রবীন্দ্রমানসে গীতাঞ্জলির আবির্ভাব। গীতাঞ্জলি বিরহের কাব্য। কবির প্রৌঢ় বয়সের রচনা। এর সব কবিতাই আধ্যাত্মিক। এই কাব্যেই মনে হলো কবি যেন সত্যের চির রহস্যময় দ্বারে এসে উঁকি মারলেন। কবি সেখানে নিঃসঙ্গ — কিন্তু প্রাচীন অর্থে নয়। আলোছায়ার মিশ্রণ নয়, এই কাব্যে আছে সঞ্চারের তীব্রতা, অনুভূতির গভীরতা আর প্রকাশের পরিমিতি। রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনের অনুভূতির পরিণতি আমরা যেন এই কাব্যে বেশি করে পাই। এখানে তাঁর ব্যক্তিত্ব তার সকল মহিমা নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। [illegible] তত্ত্ব-দৃষ্টির এত প্রমাণ গীতাঞ্জলির গানে। জীবন [illegible] অর্ধমেঘী কবি এইভাবে ব্যক্ত করেছেন:

নাই ভয়ে উদাস সুরে আনন্দ গান বাজে
সে-গান কার গভীর রবে আসিবে ডাক মাঝে।

বহুবাণী, আত্মকেন্দ্রী য়ুরোপ যখন গীতাঞ্জলিতে পাঠ করলো:

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণ-ধূলার তলে।
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে॥

তখন তার সকল অহংকার চূর্ণ হয়ে গেল। ভারতের কবির কাছে য়ুরোপের কবিরা নতি স্বীকার করলো। ভারতের কবি রবীন্দ্রনাথ কাব্য-কবিসভার শ্রেষ্ঠ আসন পেলেন। য়ুরোপ দিলো তাঁর মাথায় সোনার মুকুট। [illegible] গীতাঞ্জলি নির্বাচিত হয় নোবেল প্রাইজের জন্য। তাঁর এই গৌরবলাভে সমস্ত বাঙালীর, এমন কি সমগ্র ভারতবাসীর মুখ সেদিন উজ্জ্বল হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যকে জগতের সাহিত্যসভার শ্রেষ্ঠ আসনে বসালেন রবীন্দ্রনাথ, এ কি বাঙালীর কম গৌরব, কম গর্বের বিষয়!

রবি ঠাকুর নোবেল প্রাইজ পেলেন। সমস্ত দেশ কবির এই সম্মানলাভে আনন্দ বোধ করলো। রবির আলো এবার বিকীর্ণ হলো বিশ্বভুবনে। রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে ছিলেন। কলকাতায় এই শুভ সংবাদ আসা মাত্রই গুণী-জ্ঞানী সবাই দল বেঁধে চলে গেলেন রবিতীর্থে কবিকে সংবর্ধনা করতে। একটা স্পেশাল ট্রেন করে বোলপুরে এসে পৌঁছলেন প্রায় পাঁচশো লোক। এই স্মরণীয় ঘটনার তারিখ ছিল ২৩ নভেম্বর, ১৯১৩। শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে উৎসব হলো। নানা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও সাহিত্যিক গোষ্ঠী অভিনন্দন দিলেন কবিকে। সেদিনকার শ্রদ্ধানিবেদনের মধ্যে আন্তরিকতার কোনো ঘাটতি ছিলনা। ছিলনা কিছুমাত্র কৃত্রিমতা। নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর থেকেই তাঁর বইয়ের বিক্রী বেড়ে যায়।

—

॥ সাত ॥

এইবার বিশ্বপথিক রবীন্দ্রনাথের কথা।

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশ ভ্রমণ করেছেন তিনি জীবনের শেষ বয়স অবধি। শুধু ভ্রমণ করেননি, সেই সঙ্গে বহু ও বিচিত্র অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করেছেন। যে দেশেই গেছেন সেখানেই পেয়েছেন বিপুল সমাদর আর আন্তরিক অভিনন্দন। বাঙালি কবি যেন হয়ে উঠেছেন একজন বিশ্বনাগরিক। তাঁর মতো ভ্রাম্যমাণ লেখক বা কবি পৃথিবীতে বিরল। চিরকালই তিনি 'সুদূরের পিয়াসী' — আপন দেশের গণ্ডীর মধ্যে তাঁর বিস্ময়কারী মন যেন স্বস্তি পেতনা। তাই দেশে দেশে ভ্রমণ করেছেন তিনি ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে।

সতেরো-আঠারো বছর বয়স থেকেই তিনি পৃথিবীর পথে নেমেছেন এবং তিনটি মহাদেশের মধ্যে এমন কোনো নগর নেই যেখানে রবীন্দ্রনাথ না গিয়েছেন। তাঁর এইসব ভ্রমণের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে তাঁরই লেখা নানা বইতে। প্রথম জীবনের লেখা 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' থেকে শেষজীবনে লেখা 'রাশিয়ার চিঠি' — রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণকাহিনীগুলি বাংলার গদ্যরচনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বললেই হয়। এগুলি তাঁর কবিমানসেরই অভিজ্ঞান। কল্পনা, অভিজ্ঞতা আর মননের গভীরতা — সবকিছু মিলিয়ে তাঁর ভ্রমণকাহিনী নিছক বর্ণনা নয়, উচ্চমানের সাহিত্য; এর মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছে মহাকবির মনের রূপ, তাঁর ব্যক্তিত্ব। তোমরা বড়ো হয়ে যখন রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণকাহিনীগুলি মন দিয়ে পড়বে তখন বুঝতে পারবে এরকম ভ্রমণ সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যেও দুর্লভ।

রবীন্দ্রনাথের বিদেশ ভ্রমণের মধ্যেই আছে এ-যুগের মহাকবির বিশ্ববিজয়ের এক অপূর্ব ইতিহাস। যখন যে দেশে গিয়েছেন সেখানেই তিনি পেয়েছেন সর্বশ্রেষ্ঠ জয়মাল্য। সেজন্যেই সব দেশ হয়েছে কবির কীর্তিশালী ভ্রমণের মধ্যে। পৃথিবীর পথে নেমে পর্যটকের দৃষ্টিতে নয়, কবির দৃষ্টিতে দেখেছেন সবকিছু — এই হলো বিশ্বপথিক

রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য। এই ভ্রমণের মধ্য দিয়েই তিনি স্বদেশের অতীত গৌরবকে পৃথিবীর সামনে উজ্জ্বল করে তুলে ধরেছেন আর দেশে দেশে বহন করে নিয়ে গেছেন ভারতের প্রেমের বাণী। নিয়ে গেছেন শান্তি ও মৈত্রীর বাণী। বিশ্বপথিক রবীন্দ্রনাথ এই আধুনিক ভারতের বাণীদূত।

কবি গেলেন জাপানে ১৯১৬ সালের মাঝামাঝি।

জাপান সূর্যোদয়ের দেশ জাপান। অনেকদিন থেকে তাঁর এই জাপান দেখবার ইচ্ছা। কোবে বন্দরে প্রথম রবীন্দ্রনাথ যেদিন নামলেন, সেদিন তিনি যেন রাজ-সম্মানে সম্মানিত হয়েছিলেন। টোকিওতে তিনি আতিথ্য গ্রহণ করলেন জাপানের প্রসিদ্ধ শিল্পী টাইকানের (শিল্প-রসিক ওকাকুরা) বাড়িতে। একদা এই শিল্পী টাইকান ও তাঁদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে অতিথি হয়ে কিছুকাল বাস করে গিয়েছিলেন। জাপান ভারতীয় কবির প্রতি উদার সম্মান দেখাল। কিন্তু তখনকার জাপানের সাম্রাজ্যলোলুপতার মধ্যে শিল্পরসিক জাপানকে খুঁজে না পেয়ে কুণ্ঠিত হয়ে উঠে কবির চিত্ত। কবি তাঁর প্রকাশ্য ভাষণে জাপানের এই মনোভাবের নিন্দা না করে পারলেন না।

জাপান থেকে গেলেন আমেরিকায়।

প্রশান্ত মহাসাগরের তীর থেকে আটলান্টিক মহাসাগরের তীর পর্যন্ত শহরে শহরে বক্তৃতা দিয়ে চললেন। এবারকার ভ্রমণ ছিল দশমাসের এবং এই সময়ের মধ্যে এই ভ্রমণ এবং বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে মেলামেশা ও ভাবের বিনিময় করে জগৎটাকে তিনি যেন দেখলেন নূতন করে। তাইতো লিখলেন: 'দেশের গণ্ডী আমার ঘুচে গেছে, সকল দেশকেই আমার হৃদয়ের মধ্যে এক দেশ করে তুলতে পারলে তবে আমার মুক্তি পাব।'

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে কবি চললেন য়ুরোপে

যুদ্ধদানবের তীক্ষ্ণ নখরে ক্ষতবিক্ষত য়ুরোপ। লোকক্ষয় প্রচুর সম্পন্ন হয়ে গেছে। জেগে উঠেছে নূতন জনচেতনা। শুরু হয়েছে পুনর্গঠনের পালা। কবির প্রচারের মূল লক্ষ্য ছিল এই বিশ্বমৈত্রী সূত্র। লণ্ডনে পুরাতন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলো, শিল্পীদের সঙ্গে ভাব বিনিময় হলো আর নূতন করে হলো উদীয়মান রুশীয় চিত্রশিল্পী নিকোলাস রোয়েরিখের সঙ্গে। তাঁর আঁকা ছবি দেখে কবি বিস্মিত হয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। এবার ইংলণ্ডের মাটিতে পা দিতে না দিতেই নানা জায়গা থেকে নিমন্ত্রণ আসতে লাগলো। 'পোয়েট টেগোর' — এই কথাটি তখন ওদেশে শ্রদ্ধার সঙ্গেই উচ্চারিত হয়। সব মূলে ছিল গীতাঞ্জলি; গীতাঞ্জলির বাণী তখন ছড়িয়ে পড়েছে য়ুরোপের নানা দেশে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে।

ইংলণ্ড থেকে কবি গেলেন ফরাসী দেশে। আতিথ্য গ্রহণ করলেন প্যারিসের এক ধনীর বাড়িতে। শহর থেকে দূরে, সীন নদীর তীরে শান্ত পরিবেশ মুগ্ধ করলো কবির চিত্তকে। প্যারিস থেকে একদিন মোটরে করে কবি যুদ্ধের রণ-বিধ্বস্ত অঞ্চল দেখতে যান। চারদিকের গাছপালা কঙ্কালসার দাঁড়িয়ে, ইতস্ততঃ কামানের গোলার গভীর গর্ত। ভাঙাচোরা ঘরবাড়ি, চার্চ ফ্যাক্টরি এখানে সেখানে। সে এক বিশাল শ্মশানের মূর্তি। এই দৃশ্যে কবির চিত্তে নিদারুণ আঘাত লাগলো; তাঁর মনে হলো একালের সভ্যতার এই পরিণতি! এই মনুষ্যত্বের অবমাননা কী ভয়ংকর, এই সর্বনাশের প্রবৃত্তি তাঁর কাছে সব থেকে বড় হয়ে উঠল।

এখানে ফরাসী মনীষীদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হলো — অঁরি বের্গসঁ, সিলভাঁ লেভি — আরো অনেকে। সাক্ষাৎ হলো রোমাঁ রোলাঁর সঙ্গে। দেখা

পেট্রিক গেডিসের সঙ্গে। এই অসামান্য জৈবিক ও মনীষী তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু, বিজ্ঞানীর জগদীশচন্দ্র বসুর একখানি সুন্দর জীবনচরিত রচনা করেছিলেন। আচার্য গেডিস পাণ্ডিত্য ও মৈত্রীতে কবি মুগ্ধ হলেন। ইনি ফিলুকান্ত কবির আশ্রমে শান্তিনিকেতনে প্রথমে বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে পৃথিবীর নানা দেশ থেকে নানা মনীষী ও জ্ঞানী বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনা করতে এসেছেন নানা সময়। নবযুগের নূতন নালন্দা হয়ে উঠেছিল বিশ্বভারতী।

প্যারিস থেকে গেলেন ওলন্দাজদের দেশে। এখানেও শহর থেকে দূরে পল্লীপরিবেশে এক ধীবর গৃহে তিনি আতিথ্য গ্রহণ করেন। আমস্টারডাম, হেগ, লাইডেন, রটারডামে বক্তৃতা দিলেন। রটারডামের প্রধান গীর্জার বেদী থেকে তিনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এ সম্মান সেদিন কোনো অখ্রীস্টানের পক্ষেই ছিল দুর্লভ। হল্যান্ড ও বেলজিয়াম পাশাপাশি দেশ। ব্রাসেলসের বিচারালয়ের বিশাল কক্ষে কবির বক্তৃতা হয়। সর্বত্রই তিনি প্রচার করলেন বিশ্বভারতীর বাণী।

গেলেন সুইসদের দেশে। লুসার্ন, বাসেল, জুরিখ প্রভৃতি স্থান সফর করলেন। লুসার্নে এসে খবর পেলেন যে জার্মানরা কবির জন্মদিন উপলক্ষে বিরাট জার্মান সাহিত্যের রাশি রাশি গ্রন্থ তাঁকে উপহার দিয়েছে তাঁর বিশ্বভারতীর জন্য। কবির ভাগ্যে সে দিন ঘটল অকল্পনীয় অভিনন্দন, তাঁর প্রত্যাশার অতীত। এখান থেকে কবি জার্মানির ডার্মস্টাট ও হামবুর্গ হয়ে গেলেন ডেনমার্কে। রাজধানী কোপেনহেগেন শহরে যখন তিনি এসে পৌঁছলেন, তখন সে কী বিরাট জনতা রেল স্টেশনে! সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী

ভারতীয় কবিকে দেখবার জন্য সে কী আগ্রহ! কোপেনহাগেনের বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত হলেন বক্তৃতা দেবার জন্য। বক্তৃতার পর ছাত্ররা মশাল জ্বেলে বিরাট শোভাযাত্রা করে কবিকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে এল। রাজপথে সে কী উল্লাস, সে কী জয়ধ্বনি! কবি প্রসন্নমুখে গ্রহণ করেন এই স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন। ডেনমার্ক থেকে স্টকহলম। সেখানে সুইডিশ অ্যাকাডেমির সদস্যরা প্রস্তুত ছিলেন রবীন্দ্রনাথকে স্বাগত জানাতে। যে ভারতীয় কবিকে তাঁরা নোবেল প্রাইজ দিয়েছেন নির্দ্বিধায়, সশরীরে তাঁদের মধ্যে উপস্থিত। এই সমস্ত শহর যেন সেদিন ভেঙে পড়েছিল কবিকে দেখবার জন্য, তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য। অ্যাকাডেমিতে কবি ভাষণ দিলেন। সেই ভাষণ শুনে সকলের ধারণা হলো যোগ্য ব্যক্তিকেই এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। [redacted]

সুইডেন থেকে কবি গেলেন জার্মানিতে। গ্যেটে ও শিলারের জন্মভূমি। বার্লিনে তিনি আতিথ্য গ্রহণ করলেন বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের গৃহে। এখানকার বিশ্ব-বিদ্যালয় কবিকে নিমন্ত্রণ করলেন বক্তৃতা দেবার জন্য। সে বক্তৃতা [redacted] শুনতে জনসমাবেশ হয়েছিল বর্ণনাতীত। পনেরো হাজার লোক সমবেত হয়েছিল ভারতীয় কবিকে দেখতে। বক্তৃতা শেষ করে কবি যখন বাইরে এলেন, দেখা গেল কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার দুধারে। সেই বিরাট জনতার জয়ের বিপুল হর্ষধ্বনি আর উল্লাস কাঁপিয়ে তুললো বার্লিনের রাজপথকে। রবীন্দ্রনাথের একটি গ্রন্থের তিন রকম জার্মান অনুবাদ বেরিয়েছে। তিন মাসের মধ্যে সত্তর হাজার কপি বিক্রী হয়েছিল — এমন জনপ্রিয় হয়েছিল কবি তাদের। হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়েও কবি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এইখানেই কবি তাঁর বিখ্যাত ভাষণ 'অরণ্যের বাণী' শুনিয়েছিলেন। মুগ্ধ শ্রোতার দল নীরবে নিমগ্ন চিত্তে শুনেছিল তাঁর সেই বাণী। তাঁর বাক্যের

হৃদ আর মন। তাঁর প্রাণবান কণ্ঠস্বর আকৃষ্ট করল সবাইকে। সেই কান্তিমান দীর্ঘ উন্নত দেহ, সেই বিচিত্র পরিচ্ছদে সজ্জিত সুঠাম মূর্তি দেখে কারো যেন আশ মেটে না। তারা তাঁর প্রসারিত পরিচ্ছদের কিনারার ধুলো ভক্তির সঙ্গে চুম্বন করে মুছে নেয়। য়ুরোপ যেন নতিস্বীকার করলো ভারতের কাছে — যে ভারত এতদিন ছিল পরাধীন।

Space

য়ুরোপ থেকে ফিরলেন রবীন্দ্রনাথ।

চীনের পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলো নিমন্ত্রণ।

কবি এবার করলেন পূর্ব এশিয়া ভ্রমণ। তখন ১৯২৪ সাল। পথে তিনি রেঙ্গুন, মালয়দ্বীপ, সুমাত্রা, জাভা, বলিদ্বীপ এইসব জায়গাগুলি দর্শন করেন। সর্বত্রই পেলেন দুর্লভ রাজকীয় সম্মান। এলেন চীন দেশে। পিকিঙে চীন সম্রাটের প্রাসাদে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। এখানে তিনি এশিয়ার প্রাচীন সভ্যতা আর চীন ও ভারতবর্ষের ঐক্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করলেন। এইখানে তাঁর জন্মদিনে চীনারা তাঁর নামকরণ করেন 'চু-চেন-তাং'। কথাটির মানে হলো বজ্রের মতো পরাক্রান্ত ভারতসূর্য। তাঁর জন্মদিনে চীনারা কবিকে দিলেন নববস্ত্র আর অনেক রকম উপঢৌকন। সেইদিন শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে দেওয়া সেই নববস্ত্র পরিধান করে কবি বলেছিলেন : 'আমি যেন সূর্যের আলো প্রতিদিন নূতন জীবন লাভ করে নূতন নূতন দেশ সকলকে যেন উদ্বুদ্ধ করতে পারি।' এই কথারই প্রতিধ্বনি আছে রবীন্দ্রনাথের এই দুই লাইনের কবিতাটির মধ্যে:

জনমে জনমে নব নব দেশে রবি
নূতন প্রভাতে জাগে নববস্ত্র লভি।

এইজন্যেই সেদিন বিশ্বপথিক রবীন্দ্রনাথ শান্তি আর মুক্তির ললিত বাণী শুনিয়েছিলেন সারা পৃথিবীর মানুষকে।

পূর্ব-এশিয়া ভ্রমণ শেষ করে ফিরলেই আবার আহ্বান এলো য়ুরোপ থেকে। এবার নিমন্ত্রিত হয়ে তিনি সস্ত্রীক গেলেন ইতালিতে। মহাকবি গেলেন ইতালি। এখানে কবি যে বিপুল অভ্যর্থনা পেলেন তা যে-কোনো সম্রাটের পক্ষেও ঈর্ষার বিষয়। এবং মুসোলিনী তাঁকে সাদর নমস্কার জানিয়েছিলেন। সেদিন আমাদের ভারত ছিল পরাধীন, কিন্তু ভারতের কবি সারা পৃথিবীতে যে সম্মান লাভ করেছিলেন তা ছিল সত্যি এক অভাবনীয় ব্যাপার। বলতে সমস্ত য়ুরোপ তাঁকে নিবেদন করেছিল অন্তরের অকপট শ্রদ্ধাঞ্জলি। য়ুরোপের যে-দেশেই তিনি গিয়েছেন, অমনি তাঁর চারদিকে এসে সমবেত হয়েছেন সে-দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা। কবি এসেছেন, সাহিত্যিক এসেছেন, শিল্পী এসেছেন, বৈজ্ঞানিকেরাও বাদ যাননি আর রাজা-রাজড়া রাজপুরুষদের তো কথাই নেই। সেদিন ভারতবর্ষের বাইরে একা রবীন্দ্রনাথই হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ভারতের প্রতীক।

কেন বলছি যে তিনি যে একটি পরাধীন দেশের একজন কবি ছিলেন—আর কিছু নন। না, তা নয়। য়ুরোপ শক্তির পূজারী — মানুষের শক্তির দিকে প্রবল প্রতাপ দেখাতে হলে তার দিকেই তাকাতে হয়। কিন্তু য়ুরোপের মনের কোন কোণে আকুল হয়ে উঠেছিল আরো একটি উন্নত আদর্শের জন্য। রবীন্দ্রনাথের মুখে যখন ভারতবর্ষের বাণী শোনা গেল তা তাদের জড়বাদী আদর্শের কাছে ছিল নূতন — সম্পূর্ণ নূতন। এ জিনিস কেবল ভারতই দিতে পারে। অবসাদভারী য়ুরোপ তাঁরই হাত দিয়ে সেদিন পেয়েছিল ভারতের সব শ্রেষ্ঠ সম্পদ — তাই না সেদিন রবীন্দ্র-নামে মুখরিত হয়েছিল সমস্ত য়ুরোপ।

য়ুরোপ থেকে ফিরে আসতেই নিমন্ত্রণ এলো পূর্ব-এশিয়ার বৃহত্তর-দ্বীপপুঞ্জ থেকে। চীন যাওয়ার পথে আগে তিনি জাভা, বলীদ্বীপ প্রভৃতি স্থান হয়ে গিয়েছিলেন বটে, পরিচয়টা তেমন নিবিড় হয়ে ওঠেনি। এইবার তার নিমন্ত্রণ বিশেষভাবে এইসব দেশ দেখবার জন্য। ১৯২৭, জুলাই মাস। কবি জাভা যাত্রা করলেন। সেকালে আমাদের কথা। দু হাজার বছর হবে। ভারতবর্ষ থেকে হিন্দুরা তখন ভারতের বাইরে দিগ্বিজয় করে বেড়াতেন। সে দিগ্বিজয় ছিল সাংস্কৃতিক। ভারতের শিক্ষা, ভারতের সভ্যতা, জ্ঞান ও ধর্ম তাঁরা নিয়ে যেতেন পণ্য হিসেবে। তার সঙ্গে আসত ঐশ্বর্য।

এইভাবেই ভারতের বাইরে, ওদেশে গড়ে উঠেছিল বৃহত্তর ভারত — জাভা, বলী, শ্যাম, সুমাত্রা ও মালয়। অতীত কীর্তির নিদর্শন এইসব দেশে আজো বর্তমান। এইসব দেখবার জন্যই তাঁরা নিমন্ত্রণ জানিয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে। বলিদ্বীপে পৌঁছে কবির দৃষ্টিপথে সেদিন যে অনির্বচনীয় সৌন্দর্য উদ্ভাসিত হয়েছিল, তা দেখে মুগ্ধ চিত্তে কবি লিখলেন: 'দেখলাম ধরণীর চিরযৌবনা মূর্তি। এখানে প্রাচীন শতাব্দী নবীন হয়ে আছে। এখানে মাটির উপর অন্নপূর্ণার পাদপীঠ শ্যামল আস্তরণে দিগন্ত থেকে দিগন্তে বিস্তীর্ণ।' তেমনি বরবুদুর মন্দিরে হিন্দু সভ্যতার নিখুঁত চিত্র পাথরে উৎকীর্ণ হয়েছে দেখে মুগ্ধ হলেন তিনি। দ্বীপময় ভারত কবির অন্তরকে করে উদ্দীপ্ত, মনকে করে তোলে অতীতমুখী। দূর — অতি দূর অতীতের দিকে চলে যায় তাঁর দৃষ্টি, তাঁর চিন্তা। সেকালে আমা ভারতের ধর্ম আর সংস্কৃতি নিয়ে সাগর পার হয়ে এসেছিলেন আমাদের কোন্ পূর্বপুরুষ... গড়ে উঠল বৃহত্তর ভারত। সেই ঔপনিবেশিকের ইতিহাস আর তিনি স্মরণ করেন বরবুদুরের বিশাল মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে। স্মরণ করেন আর ভারতের সঙ্গে বৃহত্তর ভারতের

লেখকের সুদীর্ঘ

আত্মস্মৃতির ইতিহাস পুনরুজ্জীবিত করার ইচ্ছা জাগে রবীন্দ্রনাথের মনে। তাঁর মন বলে ওঠে:

এনেছি শুধু বীণা

দেখো তো চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পার কি না।

space

১৩৩০। খ্যাতনামার শিখরচূড়াতে তখন রবীন্দ্রনাথ। এই তাঁর সুযোগ শেষ সময়। এখন তিনি শুধু বাংলার কবি নন, ভারতবর্ষেরও কবি নন — তিনি এখন বিশ্বকবি। নানা সমাজ দেশ থেকে আসছে তাঁর নিমন্ত্রণ। শিলাইদহ, শান্তিনিকেতন অথবা জোড়াসাঁকো আর আর রবির আলোকে ধরে রাখতে পারে না — রবির আলো আজ বিশ্বভুবনে পরিব্যাপ্ত। নিজের কল্পনায় যেখানেই কি এত সুরে বেড়িয়েছেন তিনি? কিছুই বাদ যায়নি। যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই তিনি অভ্যর্থনার লাল কার্পেটের ওপর দিয়ে চলেছেন। কত সভা, কত উৎসব, কত অপরিচিতের মধ্যে নিত্য নূতন পরিচয়। যেখানেই গেছেন সেখানেই কবির সেই আত্মমূর্তি, পরিণত বার্ধক্যের সৌন্দর্যে অতুলনীয় চেহারা দেখে সকলেই মুগ্ধ - আনন্দে উদ্ভাসিত হলো তাঁরা।

রবীন্দ্রনাথ কিভাবে গ্রহণ করলেন তাকে? তাঁর নিজের কথাতেই শোনা। জাভাযাত্রীর পত্রে একটি লিখছেন: 'ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। নূতন নূতন ব্যবস্থায় বন্ধন নিজেকে ঠেকালি।... চলছি উজান বেয়ে, গুণ টেনে, দাঁড় বেয়ে, পালে পালে দিক বেড়িয়ে পড়ে। ... পথ সুদীর্ঘ, পাথেয় অল্প। অর্জন করতে করতে, গ্রহণ করতে আমার প্রাণ-পণ চালিয়ে আমার পা চালালো।'

১৯৩০ সালের সুযোগ এসেছিল অক্সফোর্ডে হিবার্ট বক্তৃতা দেবার জন্য। কবির দুই বছর আগে এই বক্তৃতা দেবার জন্য প্রথম আহ্বান এসেছিল, কিন্তু অসুস্থতার জন্য যেতে পারেন নি। এ সম্মানের আহ্বান এ পর্যন্ত কোনো ভারতীয় কেন, কোনো প্রাচ্য দেশবাসীই পায়নি। এই বক্তৃতায় তাঁর বক্তব্য ছিল 'মানুষের ধর্ম'। ভারতের কবি য়ুরোপকে দিলেন মানুষের ধর্ম সম্বন্ধে নূতন ব্যাখ্যা। উচ্চের বেদীতে যেন ভারতবর্ষ। কবির [illegible] জীবনে এটি একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। এর ঠিক সাঁইত্রিশ বছর আগে ভারতের বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ আমেরিকা ও য়ুরোপকে শুনিয়েছিলেন বেদান্তের উদার বাণী যা শুনে মুগ্ধ হয়েছিল পাশ্চাত্যের অসংখ্য নরনারী।

মে মাসে অক্সফোর্ডে হিবার্ট বক্তৃতাগুলি পাঠ করে, ইংল্যান্ড থেকে কবি গেলেন বার্লিনে। এখানে সাক্ষাৎ হলো বিশ্ব-বিশ্রুত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের সাথে। সপ্তাহের মধ্যে জার্মানি পরিভ্রমণ করে ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বরে কবি মস্কৌ রওনা হলেন। অনেক দিন থেকেই তাঁর সোভিয়েট রাশিয়ায় যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, এইবার সেই ইচ্ছা তাঁর পূর্ণ হলো। মস্কৌ তাঁকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানিয়েছিল। এখানকার পাইওনিয়ার্স কমিউনে গিয়েছিলেন কবি। এটি কিশোর-কিশোরীদের সংস্থা। সোভিয়েট ছেলেমেয়েরা তাঁকে অভিনন্দন জানালো, নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলো ভারতের ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে। শেষে তারা কবির কাছে একটি গান শুনবার জন্য আবদার করলো। কবি তাদের শোনালেন 'জনগণ-মন অধিনায়ক' গানটি। সে উদাত্ত মধুর কণ্ঠ তাদের মুগ্ধ করলো। সেখানে থাকতে একদিন গেলেন কৃষকদের খামারে, কর্মীদের মধ্যে অনেক প্রশ্নোত্তর হলো। কবি বিস্মিত হলেন নানা বিষয়ে তাদের আগ্রহ দেখে। রাশিয়া থেকে রবীন্দ্রনাথ

ফিরলেন অনেক নূতন অভিজ্ঞতা নিয়ে। এইসব অভিজ্ঞতার কথা লিখে রেখেছেন তাঁর 'পারস্যে' বইতে।

কবির বয়স তখন বাহাত্তর বছর। এমন সময়ে নিমন্ত্রণ এলো পারস্য দেশ থেকে — পারস্যের (এখনকার নাম ইরান) শাহেনশাহ রেজাশাহ পেহলবী স্বয়ং নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন রবীন্দ্রনাথকে। এই প্রথম আকাশপথে তিনি এই বিদেশ যাত্রা করেন। পারস্যের প্রাচীন শহর শিরাজ — কবি হাফেজ ও সাদীর জন্মভূমি। সাদীর সমাধি-উদ্যানে রবীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনা হলো। হাফেজের সমাধিস্থল দেখতে গেলেন একদিন। তাঁর পিতার প্রিয় কবি হাফেজ। ছেলেবেলায় তিনি তাঁর বাবাকে হাফেজ থেকে মনের আনন্দে আবৃত্তি করতে শুনতেন। শিরাজ শহরে সাতদিন কাটিয়ে পারস্যের স্থাপত্যের অতুলনীয় শোভা ও ঐশ্বর্য উপভোগ করলেন কবি। সেখান থেকে ইস্পাহান। ইস্পাহান থেকে রাজধানী তেহরানে এলেন রবীন্দ্রনাথ। রেজাশাহ তাঁকে জানালেন সংবর্ধনা। একাত্তরের (১৯৩২) জন্মদিন এখানেই উদ্‌যাপিত হয়। কাব্যোৎসবে অজস্র ভালবাসার সৌন্দর্যমণ্ডিত অতি সমারোহের মধ্যে এই দেশের প্রতিপালিত হয়েছিল।

ইরাক থেকে নিমন্ত্রণ এলো। সম্রাট দরায়ুসের ঐতিহাসিক শিলালিপি খোদিত পার্বত্য পথ দিয়ে তেহরান থেকে কবি চললেন আরবদেশ ইরাকে। পথে বাগদাদ। সেখানে আরবের কবিকে দেখবার জন্য সে কী ভিড়! রাজা ফয়জল স্বয়ং অভ্যর্থনা করলেন তাঁর সভায়। বাগদাদ শহরে তাঁকে যথারীতি সংবর্ধনা জানানো হলো। কিন্তু আরবের নাগরিক সভ্যতায় কবির মন ভরল না। কবি চললেন মরুপ্রান্তরে বেদুইন সর্দারদের

তাঁবুতে। যৌবনে যাদের উদ্দেশ্য করে তিনি লিখেছিলেন: 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন', [redacted] আর দীর্ঘ সময় পরে সেই বেদুইনদের নৃত্য দেখতে গেলেন রবীন্দ্রনাথ। বেদুইনরা তাদের তাঁবুতে অতিথিকে ভোজ দিল; দেখলেন তাদের রণনৃত্য।

এইভাবে দেশে দেশে ভ্রমণ করে রবীন্দ্রনাথ, একাধিকবার যেমন বিপুলা এই পৃথিবীকে প্রত্যক্ষ দেখেছেন, পূর্ণ করেছেন তাঁর শৈশবের সাধ, তেমনি অন্যদিকে তেমনি স্থাপন করেছেন আন্তর্জাতিক মানসিক সম্পর্কের সেতু। য়ুরোপ কেন তাঁকে এমন আন্তরিকতার সঙ্গে বার বার অভ্যর্থনা করেছিল? তার উত্তরে বলা যায় যে, সেদিনকার, অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ের য়ুরোপের নর-নারী যেন রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যেই খুঁজে পেয়েছিল তাদের মনের শান্তি ও আশ্বাস। এমন কি সারাজীবন লোকের মনে জন্য অস্থির হয়ে যখন বিশ্বের বিরুদ্ধ ভাব ছিল, তার দু'একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি।

রবীন্দ্রনাথ তখন প্যারিসে থাকেন। একদিন ট্যাক্সি চড়ে কোন একটা সভায় তাঁকে যেতে হয়েছিল। সঙ্গে ছিলেন আমাদের জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ নেমে যাওয়ার পর ট্যাক্সিচালক শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করেন — এই মহিমান্বিত মানুষটি কে! উত্তর হলো: সিনর রবি টেগোর — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই সেই ট্যাক্সিচালক সবিনয়ে তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে। বললে: আমি কবির 'ডাকঘর' নাটকের ফরাসী অনুবাদ পাঠ করে বিশেষ আনন্দ পেয়েছি, তাঁকে বহন করেছি এ আমার সৌভাগ্য। কি করে ভাড়া নেব? কি করে নেব ভাড়া? এখানি সাধ্য হলেও অসম্ভব। তখনকার সর্বসাধারণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের, ছড়িয়েছিল এ রকম খ্যাতি। কবির পর অনবরত, তাঁর মত সুন্দরভাবে বিশ্বের দরবারে আর কেউ প্রচার করতে পারেন নি। ভারতকে

।। আট ।।

শুধু কল্পনার রাজ্যে বাস করেন নি রবীন্দ্রনাথ।

পিতার জমিদারির তদারক করেছেন, নিজের সংসারবৃক্ষ প্রতিপালন করেছেন, আবার বন্ধুজনের প্রতি কর্তব্য পালনও করেছেন। তিনি যেমন ছিলেন কর্তব্যপরায়ণ স্বামী, তেমনি স্নেহশীল পিতা। কবি হলেও তিনি মানুষ, প্রতিদিনের দেখা সাধারণ মানুষের মতো সুখদুঃখ, স্নেহ-দয়া ও মায়া-মমতার সুতীব্র অনুভূতি ছিল তাঁর। সংসারের শত শত কাজের মধ্যে, সুখদুঃখ শান্তি উদ্বেগের মাঝে তাঁকে তিনি কল্যাণলক্ষ্মীর অনুভব করেছেন। তখন জোড়াসাঁকোর বাড়ি বহু লোকপূর্ণ। ছেলেমেয়েরা কবির আদর্শে মানুষ হচ্ছে। কবির তখন পাঁচটি ছেলে মেয়ে — রথীন্দ্রনাথ, মাধুরীলতা, রেণুকা, মীরা আর শমীন্দ্রনাথ। শমী তখন শিশু। এমন অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ ছেলেমেয়েদের নিয়ে আলাদা সংসার পাততে চাইলেন।

শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে সংসার পাতলেন রবীন্দ্রনাথ।

ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন ঘরেই। কুঠিবাড়িতে তাদের জন্য খুললেন ছোট একটি স্কুল। তিনজন শিক্ষক রাখলেন। মেয়েরা বড়ো হচ্ছে, বিয়ের বয়স তাদের প্রায় হয়ে এলো — বিশেষ করে বড়ো ও মেজ মেয়ের। বড় ছেলে রথীন্দ্রনাথের এনট্রান্স পরীক্ষার সময়ও হয়ে এল। কবি এবার স্থির করলেন শান্তিনিকেতনে এসে বাস করবেন। স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরাও সেখানে থাকবে। প্রথমে কলকাতায় এসে বড়ো মেয়ে দুটির বিয়ে দিলেন। নূতন করে শান্তিনিকেতনে সংসার পাতবার জন্যে স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের নিয়ে এলেন সেখানে। একটা নূতন বাড়ি

বাড়ির পত্তন করলেন। স্কুল আর সংসার – এই দুটি কাজ একসঙ্গে হাতে নিলেন। স্কুলের কথা আগেই বলা হয়েছে। ভেবেছিলেন শান্তিনিকেতনের এই নূতন বাড়িতে তাঁর ঘর-সংসার পাতবেন। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় অন্যরকম। এক বছরের মধ্যেই কবি-পত্নী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু হলো। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন একচল্লিশ। মেজ মেয়ে মীরার বয়স দশ; ছোট ছেলে শমীন্দ্রের বয়স আট বছর।

স্ত্রীর মৃত্যু হলো। কবির অন্তরের শোক ও বেদনার ফল্গুধারা প্রবাহিত হলো নানা কবিতায়। শোকে তাঁর প্রতিক্রিয়া অসাধারণ। জীবনে বহু আঘাত পেয়েছেন তিনি। মৃত্যুর রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন নানা সময়ে নানাভাবে। কিন্তু বিচলিত হননি কখনো। তিনি বলতেন – সংসার কর্মভূমি, কর্তব্যস্থল। স্ত্রীর মৃত্যুর পর মেজ মেয়ের অসুখ করলো। কঠিন অসুখ – যক্ষ্মা। [illegible] পীড়িত মেয়েকে নিয়ে গেলেন হাজারীবাগে। তাঁর অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের [illegible] বাস করলেন। সেখান থেকে আলমোড়া। তারপর একদিন কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্র প্রবাসে কলেরায় মারা গেল। কবির মনে নিদারুণ আঘাত লাগে। সেই আঘাতে তাঁর অন্তরের পিতৃস্নেহ যেন উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। মাতৃহীন শিশুপুত্র শমী তার বাবার কাছে পিতার ও মাতার উভয়েরই স্নেহ লাভ করেছিল

কবির অন্তরের সেই সুগভীর স্নেহ থেকেই উৎসারিত 'শিশু' কবিতাগুলি [illegible] পরিপূর্ণ। রবীন্দ্র-প্রতিভার এক অসাধারণ নিদর্শন 'শিশু'। এই কাব্যে আত্মীয়তার সঙ্গে মিশে রয়েছে এক রহস্যময়তা। সমুদ্রের কাব্যসংসার বিস্তারিত, তবু একটির কথা বলি 'শিশু':

জগৎ-পারাবারের তীরে
ছেলেরা করে খেলা।

এই পরম রহস্যকে তাঁর অন্তরের সমস্ত অনুভূতি দিয়ে উজ্জ্বল করে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ।

শিশু মনের কথা যেমন অসামান্য ভাবে আর কোনো কবি তুলে ধরতে পারেন নি; শিশুমনের কথা যেমন মর্মস্পর্শী ভাষায় আর কেউ ব্যক্ত করেন নি। রবীন্দ্রনাথের মনে উন্নত অত বড়ো ভাবুক, সারা বিশ্বের সম্মানিত অত বড়ো জ্ঞানী মনীষী, অথচ তাঁর সুন্দর সৌম্য মূর্তিখানি সব সময় ছিল শান্তিপূর্ণ আর আনন্দে ভরা। তাঁর কাছে ছেলে মেয়েদের সুযোগ ছিল অবারিত, তাঁর সঙ্গে তারা কথা বলতো সম্পূর্ণ নিঃসংকোচে। কবির সঙ্গ লাভ করে মন তাদের ভরে উঠতো মহা উল্লাসে। তাইতো কবির অন্তর ছন্দের উচ্ছ্বাসে গেয়ে উঠলো:

ছোট হয়ে আমি রহিব তোমারে ঘেরি।
তোমার ক্ষুদ্র জীবন গড়িব
হাসির আলোকে ভরি।

সত্যি, রবীন্দ্রনাথ ছোটদের আনন্দ দিয়েছেন অনেকই অনেক হায়। সারা দেশের কবি তিনি— অথচ ছোটদের তিনি যেন ছিলেন সবচেয়ে আপনজন। কত না আগ্রহের সঙ্গে তিনি অনুভব করেছেন শিশুদের মনের কথা, তাদের প্রাণের আশা। আর কী আকুতিই না ছিল তাঁর মনের মনের কথা বলবার জন্য।

শিশু তার মা-কে সরল মনে জিজ্ঞাসা করছে, মা, আমায় তুমি কোথায় পেয়েছ। মাতৃহৃদয়ের সকল কোমলতা মিশিয়ে কবি লিখলেন:

সব দেবতার আদরের ধন

নিত্যকালের তুই পুরাতন,
তুই প্রভাতের আলোর সমবয়সী।
তুই জগতের স্বপ্ন হতে
এসেছিস আনন্দ স্রোতে
নূতন হয়ে আমার বুকে বিলসি।

কাব্যজগতের কোহিনূর 'শিশু'। মনে হয়, এই কাব্যে কবি যেন তাঁর জীবন-উপলব্ধির দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে শিশুর মুখে যেমন একটা দ্যুতি প্রত্যক্ষ করেছেন – যেন সকালবেলার সূর্যের আলো গাছের পাতা ফোঁকড়ের ফাঁকে ফাঁকে দীপ্ত হয়ে এসে লেগে পড়ছে। সমস্ত কাব্যখানির ভিতরে একটা চির-নবীন রহস্যের স্পর্শ, একটা চিরচঞ্চল প্রাণ যেন কলকল করছে। নিবিড় বাৎসল্যরস যেন উপচে পড়ছে এর প্রতিটি কবিতা থেকে :

তোমার কটিতটের ধটি কে দিল রাঙিয়া,
কোমল গায়ে দিল পরায়ে, রঙিন আঙিয়া।

পৃথিবীর সকল শিশুদের উদ্দেশে যে আশীর্বাদ কবি রেখে গেছেন এই কাব্যের স্বর্ণপাত্রে, তেমন প্রাণ-মাতানো আশীর্বাণী সারা বিশ্বেও খুঁজে পাওয়া যাবেনা একমাত্র কবির লেখার মধ্যে।

আশিস আসি পরশ করবে
তোমারে ফিরে ফিরে—
কার কি কেহ কোথায় হবে সে
রহিবে তব শিরে?

তবুও শিশু তার নূতন চোখ মেলে পৃথিবীর পানে চাইলো। যেমন যে শিশু ধীরে ধীরে বড় হলো, কবিও রয়েছেন সকলসময়ে তার পাশে। মায়ের কথায় শিশুকে তিনি বলছেন:

আমার খোকা মনের কথা কয়।
কিন্তু তার প্রশ্ন বেশী,
কে বুঝে তার অর্থ!
মৌন থাকে সর্বে?
মায়ের মুখে মায়ের কথা
শিখিতে তার কি আকুলতা?
তাকায় তাই বোবার মত
মায়ের মুখচাঁদে'

আবার কখনো মা খোকার মুখ দিয়ে বলছেন:

আমি যদি দুষ্টুমি করে
চাঁপার গাছে চাঁপা হয়ে ফুটি
ভোরের বেলা মা গো ডালের পরে
কচি পাতায় করি লুটোপুটি।

শিশু ও তার মা— সংসারের এই দুটি পবিত্র হৃদয়ের মাঝে যে যে অপূর্ব ছবি কবি সৃষ্টি করেছেন, তা চিরকালের। এই অনবদ্য কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমেই রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ — রয়েছেন তিনি বাংলার মায়েদের বুকে কোলে চোখের পাতায় চিরন্তনভাবে মিশে নিবিড় হয়ে। শিশু-হৃদয়ের সকল

মমতা, সকল ব্যাকুলতা দিয়ে তাই তো খোকা তার মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাবার সময়ও বলছে:

তবে আমি যাই গো তবে যাই
ভোরের বেলা শূন্য কোলে
ডাকবি যখন খোকা বলে
বলব আমি - নাই সে খোকা নাই!
মা গো যাই!

শিশু-মনের এমন সুন্দর প্রকাশ আছে এই গ্রন্থে। রবীন্দ্রনাথ শিশুদের লেখেছেন ঠিক তাদেরই মন নিয়ে — তিনি যে ছিলেন চিরদিন তাদেরই সমবয়সী, সমধর্মী। তাই না তিনি বলেছেন: 'বিধাতার নিজের হাতে তৈরি শিশুর কবিতার মন থেকে কিছুতেই ভোলেনা। কোনোদিন ওদের চোখ বুড়ো হয়না, মন বুড়ো হয়না। তাই চিরনবীন এই পৃথিবীর সঙ্গে ওদের চিরদিনের বন্ধুত্ব থেকে যায়।' কী গদ্য, কী পদ্য, শিশুদের জন্য লিখবার প্রসঙ্গ বা অবকাশ পেলেই কবির মন আনন্দে নেচে উঠতো। সত্তর বছর বয়সেও তিনি বাংলার এক শিশুকে লিখছেন:

লিখতে যখন বলো আমায়
তোমার খাতার প্রথম পাতে
তখন জানি, কাঁচা অক্ষর
নাচবে আজো আমার হাতে।
... ...
নতুন চিকন অশথ-পাতা

ওরই কলরে আপনি নাচে
সেই কলরে মোর হৃদয়
তোমার হৃদয় বাঁধা আছে।

space

তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পারো, শিশুদের এমন সকলকে আবিষ্কার করলেন কবি কি করে? তাঁর সুবিশাল কাব্য-সৌধ দাঁড়িয়ে আছে কবির সেই শিশুকল্পনার ভিত্তির ওপর। রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনা যে তাঁর শিশুকল্পনার দ্বারা আচ্ছন্ন। তোমাদের অনেকেই 'কড়ি-ও-কোমল'-এর সেই স্বর্ণ-কাননে সে তো দুটি — 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' আর 'মনে পড়ে কখন' শিখেছ পড়ে থাকবে। কবির শিশুকল্পনার সার্থক প্রকাশ পাই এখানে। বাংলার শিশুদের ঘুম-পাড়ানো ছেলেভুলানো ছড়া ও রূপকথা অনুরণিত হয়েছে এই দুটি কবিতায়। আবার 'চিত্রা' কাব্যের এই 'যেতে নাহি দিব' কবিতায় দেখা দিয়েছে কবির বাৎসল্য দৃষ্টির এক নূতন দিগন্ত। 'শিশুভাবের মর্মবাণী' যেন আমরা ওরই মধ্যে পাই।

স্ত্রীর অকাল মৃত্যু, মা-হারা শিশুপুত্রের বুক বেদনা, অতঃপর বালিকা মেয়ের প্রাণসংশয় অসুখ — ব্যক্তিগত জীবনের এই শোকাবহ ঘটনাগুলিই তো সেদিন কবিচিত্তে বাৎসল্য অনুভবের দ্বার খুলে দিয়েছিল। তাই তো নিত্যকালের শিশুটির হাসিকান্নার চেহারা দেখে উঠেছে তাঁর 'শিশু' কাব্যে। এখানে শিশুর মাঝে বিশ্বকে না দেখে কবি নিখিল বিশ্বের মধ্যে চিরন্তন শিশুকে প্রত্যক্ষ করেছেন।

শিশুমনের রহস্য অপার। যে-রহস্য ঘনিয়ে তুলবার চেষ্টা পৃথিবীর আর কোনো কবি সফলে করেননি। 'মানবসংসারের গোকুলবৃন্দাবনে

খাবার নূপুর ঝংকারে চকচকময় স্বপ্ন, কিন্তু সংসারের বড় প্রাঙ্গণে যাদের ঝিলিমিলি ঝিরঝিরে বাস সেইজন্যে যেমন শান্তিরবনের টুকু সমর্পিত — সেই চিরন্তন শিশুকে আমাদের মনের প্রাঙ্গণে শাশ্বতভাবে রেখে গিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। মা গিয়েছেন ও-পাড়ার দীঘিতে ঘট কাঁখে করে জল আনতে। সেই ফাঁকে ঘুমচোরা ঘরে ঢুকে খোকার ঘুম চুরি করে আকাশে উধাও হয়ে গেল। মা ফিরে এসে অবাক — দেখেন, তাঁর সেই দুরন্ত খোকা ঘরময় হামাগুড়ি দিয়ে ফিরছে। এ কী কাণ্ড, মা ভেবেই আর অমনি সেই ঘুমচোরার সন্ধানে বেরিয়ে পড়বার জন্যে ছুটতে থাকে মায়ের কাছে!

যার খুশি রাগ করো সেই কেন আজ
আলো যেথা রোজ বলে দেখো কি;
শুধাব মিনতি করে আমাদের ঘুমচোরে
তোমাদের কাছে ঘুম আসেনি কি?

শিশুর কাণ্ড নিত্য। কিছু বাস্তব আর কিছু কল্পনা মিলিয়ে তৈরি সে-কাণ্ড। এই যে শিশুর মন বুঝতে পারে না সংসারের শৃঙ্খলের কী মানে। এইতো সেদিনের মন-কে শুধায়:

মনে হয় না উঠল চাঁদের আলো,
মনে হয় না সন্ধ্যা হ'ল যেন।
রাতের বেলা দুপুর যদি হয়
দুপুর বেলা রাত হবে না কেন?

তোমরা যখন বড়ো হয়ে শিশু ভোলানাথ খুলে পড়বে তখন

বুঝতে পারবে তাঁর একখানি কবিতার মধ্যে আছে কবির নিজের শৈশব-কল্পনার ছোঁয়া। তিনি যেন নিজের অতীত শিশুকালকে ফিরে পেয়েছেন। এই যে কল্পনার সঙ্গে মিশেছে বাস্তবতার স্পর্শ। তার ফলেই কবিতাটি এমন সুন্দর হয়ে উঠেছে। যুগ বদলে, যুগ চলে যাবে, কিন্তু কাব্য-পারাবারের তীরে যে চিরকাল শিশু, বালুকা দিয়ে ঘর বেঁধে ঝিনুক নিয়ে খেলা করবে, যে তার নিজের হাতে কাগজের নৌকা তৈরি করে বিপুল নীল সলিলে তার সেই খেলার তরী ভাসাবে, যে শিশু বলবে, সে ঢেউ হয়ে তার মায়ের কোলে লুটিয়ে পড়বে — নিখিল বিশ্বের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সেই শিশুকেই রেখে গেছেন। রেখে গেছেন শাশ্বত দেশের জন্য অপূর্ব সাহিত্য যার মধ্যে উদ্ভাসিত হয়েছে অনবদ্যভাবে অন্তরের কামনা আর নিখিল মাতৃহৃদয়ের চিত্ররূপ।

—